কুন্তলীন পুরস্কার

১৩০৬ সন।



এইচ বসু, পারফিউমার

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।


কুন্তলীন প্রেসে
মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

বিগত বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত রচনার মধ্য হইতে যে কয়েকখানি পুরস্কারের উপযুক্ত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইল। পুরস্কৃত রচনার মধ্যে প্রথম আটটী পুরস্কার ভূতপূর্ব্ব ট্রিবিউন ও বর্ত্তমান প্রভাত সম্পাদক সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ যাঁহাদের অনুগ্রহে আমরা বৎসর বৎসর এই প্রকার পুরস্কার দ্বারা সাহিত্য চর্চ্চায় লেখক লেখিকাদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উৎসাহিত করিতেছি এবং পুরস্কৃত গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া ভদ্রসাধারণকে উপহার দিতে সমর্থ হইতেছি, তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের প্রস্তুত কুন্তলীন দেলখোস্ ইত্যাদির ক্রেতা মাত্রেই যে এই সদনুষ্ঠানের সাহায্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কারের নিয়মাবলী পুস্তকের শেষভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

কুন্তলীন আফিস
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৭।

নিবেদক
শ্রীএইচ বসু।

সূচী

  

প্রথম পুরস্কার ৫০৲

অদ্ভুত-হত্যা।

(১)

কৃত্রিম-মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমাকে ময়মনসিংহ অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। প্রায় সপ্তাহ কাল তথায় থাকিয়া সে মোকদ্দমার যথাসম্ভব প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া গোয়ালন্দ-ট্রেণে রাত্রে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করি। পরদিন প্রাতঃকালে কাগজ পত্র গুছাইয়া রিপোর্টাদি লিখিয়া নিজের কোন প্রয়োজন বশতঃ জনৈক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে এক জন কনেষ্টবল যথারীতি লম্বা সেলাম ঠুকিয়া, একখানা সরকারী চিঠি আমার হস্তে প্রদান করিল। চিঠির উপরে লাল কালিতে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লিখিত "অতি দরকারী"—এ দুটী কথা সর্ব্ব-প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কনেষ্টবলকে বিশ্রাম ঘর দেখাইয়া দিয়া, ত্রস্ত হস্তে চিঠি খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিলাম। পত্রে প্রধান কর্ম্মচারী যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ;—

"আজ চারি দিবস গত হইল, মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটী ছাত্রাবাসে মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটী ছাত্র অতি আশ্চর্য্যরূপে হত হইয়াছে। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত খুনের কিনারা করিতে পারে নাই। তুমি মুহূর্ত্তমাত্র গৌণ না করিয়া উক্ত হত্যা ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। মুচিপাড়া থানার পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যা ব্যাপারের প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছে।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার বন্ধুদর্শনবাসনা পলকে বিলুপ্ত

হইল। সেই কৃত্রিম মুদ্রার জটিল মোকদ্দমার গুরুভার হইতে মুক্ত হইতে না হইতে আবার এক হত্যা কাণ্ডের গুরুতর ভার মস্তকে বহন করিতে হইবে ভাবিয়া মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, সুতরাং আর ইতস্ততঃ না করিয়া কনেষ্টবলকে বিদায় দিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে অবিলম্বে মুচিপাড়া থানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে বড়সাহেবের লিখিত পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত করাইলে তিনি আমাকে উক্ত হত্যা ব্যাপারের প্রধান অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারীর নাম সুশীল বাবু; সুশীল বাবু আমার পূর্ব্ব পরিচিত। ইনি আমাকে হত্যা সম্বন্ধে নিজ তদন্তে যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা একে একে সন্তুষ্টির সহিত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। হত্যাসংক্রান্ত আমূল বিবরণ শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, এ ব্যাপারের কিনারা করা বড় সহজ-সাধ্য নহে। পুলিশানুসন্ধানে এ সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল —

"মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী বিক্রমপুর অঞ্চলের বজ্রযোগিনী গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম ৺হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশ কলিকাতা সিটি কলেজের দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। মির্জাপুরের এক ষ্টুডেণ্ট মেসে ইঁহার বাসা ছিল। ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার বন্ধে সেই মেসের অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল, কেবল তিন জন বি, এ, পরীক্ষার্থীর সহিত মহেশচন্দ্র বন্ধের সময়ও সেই মেসেই ছিলেন। মেসের দালানটী দ্বিতল; উপরে চারিটী ঘর, নীচে দুটী। মেসে অধিক ছাত্র না থাকায়, পড়া শুনার সুবিধার নিমিত্ত চারিটী ঘরে চারি জন ছাত্র শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নীচের একটী ঘরে রান্না; এবং অপরটীতে খাওয়া-দাওয়ার কার্য্য সম্পন্ন হইত। মেসে এক্ষণে একটী মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারাই সর্ব্ব কার্য্য চালিত হয়। ব্রাহ্মণটী রাত্রে মেসে থাকে না। ২৬শে আশ্বিন রাত্রিতে, মহেশচন্দ্রকে অন্যান্য

রাত্রির ন্যায় সকলে সুস্থ শরীরে আপন ঘরে পড়িতে দেখিয়াছেন। পর দিবস প্রত্যুষে অতুল বাবু নামে ঐ-মেসেরই অন্যতম ছাত্র যখন মহেশচন্দ্রের ঘরের মধ্য দিয়া নিম্নতলে যাইতেছিলেন, তখন তাহাকে ছিন্ন-কণ্ঠ, রক্তাক্ত কলেবর দেখিতে পাইয়া উচ্চ চীৎকারে সকলকে সেখানে একত্র করেন। পরে, তথায় উপস্থিত সকলের পরামর্শ মত অগৌণে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া সে ঘরে একখানা রক্ত-রঞ্জিত বড় কাটারী ও একপাটি নাগ্‌রা জুতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ গুলি ইতিপূর্ব্বে মেসের কেহ কখন দেখে নাই। হত্যাকারীর এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, হত্যাগৃহের একটী সামান্য জিনিস কিম্বা একটী কপর্দ্দকও স্থানান্তর হয় নাই। মহেশের চাবি তাহার পকেটে পাওয়া গিয়াছে; উক্ত চাবি দ্বারা পুলিশ মহেশের পোর্টমেণ্ট ও হাত বাক্স খুলিয়া টাকা পয়সা মহেশের লিখিত হিসাবের মিল মতনই পাইয়াছেন।

"মহেশের সহিত যে সে মেসে কাহারও মনোমালিন্য বা বিবাদ ছিল, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনটী ছাত্র ও ব্রাহ্মণের 'জবানবন্দী'তে হত্যার অনুসন্ধানে কার্য্যকরী হইতে পারে, এরূপ কোন কথাই প্রকাশ পায় না। ইঁহাদের কেহ কাহাকে মহেশের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করেন না। পরন্তু মহেশের সহিত সকলেরই সদ্ভাব ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।"

পুলিশের এই রিপোর্ট দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণ ও ছাত্রত্রয়ের জবানবন্দী আনুপূর্ব্বিক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া অনুসন্ধানের কোন সূত্রই বাহির করিতে পারিলাম না। তবে জুতা ও কাটারীখানা দেখিতে হইল। সুশীল বাবু তৎক্ষণাৎ সেগুলি আমার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। আমি তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম, রক্তাক্ত কাটারিখানা অপূর্ব্বব্যবহৃত। জুতাখানিও একেবারে অব্যবহৃত বলিয়াই বোধ হইল। উহা পায়ে দেওয়ার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। সুতরাং এ গুলি অনুসন্ধানের পক্ষে কোন সহায়তা করিবে, এরূপ মনে করিতে পারিলাম না। আমি সেখানে আর বেশী সময়

অপেক্ষা না করিয়া সেই মেসটী দেখিতে মনস্থ করিলাম এবং সুশীল বাবুর সহিত সেই মেসে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন পূজোপলক্ষে স্কুল কলেজাদি বন্ধ ছিল, সুতরাং সকলকেই বাসায় প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমি প্রথমে হত্যাগৃহ এবং তৎপরে মেসের অন্যান্য স্থান যথারীতি পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু হত্যা সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিশেষে আমি হত্যাগৃহে প্রথম উপস্থিত সেই অতুল বাবুকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং উত্তর আমার নোট-বহিতে লিখিয়া লইলাম।

আমি। আপনি সে দিন প্রাতেই প্রথম সে কক্ষে পদার্পন করিয়াছিলেন, না, রাত্রে সে কক্ষের ভিতর দিয়া আর কোন বার নীচে নামিয়া ছিলেন ?

অতুল বাবু। না, সেই প্রথম আমি সে কক্ষে প্রবেশ করি।

আমি। যে রাত্রে মহেশ খুন হয়, সে রাত্রে সর্ব্বশেষ তাহাকে কে জীবিত দেখিয়াছিলেন ?

অ, বাবু। সর্ব্বশেষ কে জীবিত দেখিয়াছিলাম, মনে নাই। আমরা সকলেই একসঙ্গে নীচের ঘর হইতে উপরে আসিয়া আপন আপন কক্ষে পড়িতে বসিয়াছিলাম।

আমি। আপনারা সেদিন শয়ন করিবার পূর্ব্বে আর নীচে যান নাই ?

অ, বাবু। আমি সেদিন আর নীচে যাই নাই।

আমি তখন আর দুজনকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা তদুত্তরে বলিলেন; সে রাত্রে তাঁহাদের কাহারও নীচে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম।—

"আপনাদের মেসের ছাত্রগণ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত মহেশ বাবুর বিশেষ জানাশুনা ছিল বলিয়া আপনারা জানেন ?"

অ, বাবু মহেশ বাবুর বিশেষ বন্ধু ত কেহ দেখিতে পাই না।

আমি। মহেশ বাবুর কাহারও সহিত শত্রুতা বা মনোবিবাদ ছিল, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। না, মহাশয়, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতার কথা আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

আমি। হত্যার দিনে মহেশ বাবু সমস্ত দিবস কি মেসেই ছিলেন, না, কোথাও বাহির হইয়াছিলেন ?

অ, বাবু। (খানিক চিন্তার পর) হাঁ, মহেশ বাবু সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বাহিরে গিয়াছিলেন।

আমি। কোথায় গিয়াছিলেন, বলিতে পারেন ?

অ, বাবু। না, তাহা বলিতে পারি না।

আমি। মহেশ বাবুর কি বেড়াইবার অভ্যাস ছিল ?

অ, বাবু। মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন বৈ কি !

আমি। হত্যার তারিখে কোন্ সময়ে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ?

অ, বাবু। বোধ হয় রাত্রি ৭॥টা, কি ৮টার সময়।

আমি। মহেশ বাবুর স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল, আপনার বিশ্বাস।

অ, বাবু। (একটু বিরক্তির সহিত) ওগুলি কি বলিব ?

আমি তখন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলাম, "দেখুন, আপনারা সকলেই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান। অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, এ হত্যার কিনারা করা বড় সহজ সাধ্য নহে। কেহ অর্থলোভে এ নৃশংস কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছে, অবস্থাপর্য্যবেক্ষণে, এমন বিশ্বাস আমি করিতে পারিতেছি না। ঈর্ষামূলেই বোধহয় এ লোমহর্ষণ হত্যা সংশাধিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি আমি হত ব্যক্তির সম্বন্ধে সমস্ত কথা অবগত হইতে না পারি, তবে প্রকৃত দোষীর অনুসন্ধান কিরূপে করিতে সমর্থ হইব? আর অবশ্য ইহাও আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, যদি কোন প্রকারেই এ হত্যার কূল-কিনারা করা না যায়, তবে পুলিশ শেষ কালে আপনাদের লইয়াই টানাহিচ্ড়া করিতে পারে। কে জানে, আপনাদের কেহ এ ব্যাপার বিজড়িত নহেন ? এ বাড়ীতে অপর কেহ বাস করেনা, মহেশ বাবুর সহিত অন্য কাহারও শত্রুতা ছিল না একথা আপনারাই বলিতেছেন; এমতাবস্থায় কাহার উপর প্রথম সন্দেহদৃষ্টি

পড়িতে পারে; তাহা আপনারাই ভাবিয়া দেখুন। হত্যাগৃহে প্রাপ্ত কাটারি-খানি সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং হত্যাকারী যে পুরাতন-পাপী নহে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে—একপাটী নাগরাজুতা পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে ইহা আপনাদের চালাকি নয়?—

আমি এতদূর বলিলে ছাত্রবাবুটী অপেক্ষাকৃত কাতরস্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করুন মহাশয়, আমি যাহা জানি, বলিতেছি। আমার বিশ্বাস মহেশবাবু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন না।

আমি। কাহার সঙ্গে, কোথায়, মহেশ বাবুর আসা যাওয়া ছিল, বলিতে পারেন?

অ, বাবু। সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। তবে তিনি মধ্যে মধ্যে অনেক রাত্রির পর বাসায় আসিতেন এবং মাঝে মাঝে একটী ঝি শ্রেণীর স্ত্রীলোক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত।

আমি। ঝির ঠিকানা আপনি জানেন?

অ, বাবু। না, মহাশয়, ঠিকানা জানি না।

আমি। ঝিকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন?

অ, বাবু। হাঁ, পারিব বৈ কি? হত্যার তারিখেও দিনের বেলায় ঝি তাহার নিকট আসিয়াছিল।

আমি। যে দিন হত্যার কথা জানিতে পান, সে দিন প্রথমে কে সদর দরজা খুলিয়াছিলেন?

অ, বাবু। সম্ভবতঃ সদর দরজা খোলা ছিল।

আমি। সদর দরজার খিলান ত অভগ্ন; তবে হত্যা কিরূপে সংঘটিত হইল, আপনাদের বিশ্বাস?

অ, বাবু। সদর দরজা মধ্যে মধ্যে খোলাও থাকে। বোধ হয় সে রাত্রে আমরা কেহ দরজা ভেজাই নাই। বামনটী চলিয়া গেলে, কোন দিন দরজা ভেজান যায়, কোন দিন বা যায় না।

আমি। বামনটী কেমন, কতদিন যাবৎ এখানে কাজ করিতেছে?

অ, বাবু। অনেক দিন। বামনটী খুব বিশ্বাসী, সে আমাদের বড় যত্ন করে।

আমি এপর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া সুশীল বাবুর সহিত মেস হইতে বহির্গত হইলাম। তখন বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছে। সুতরাং আর থানায় না যাইয়া, সুশীল বাবুকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া, বরাবর বাসাভিমুখে অগ্রসর হইতে গাড়োয়ানকে আদেশ করিলাম।

(২)

আমি অনুসন্ধানের সূত্র উদ্ভাবনার্থ যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, প্রথমে ততই নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইতে আরম্ভ করিলাম। আমি বুঝিয়া উঠিলাম না, এ হত্যা কাহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ধনাপহরণ মানসে কি এ হত্যা সংঘটিত হওয়া সম্ভব? তাহা হইলে এক গাছি তৃণেরও বিপর্য্যয় ঘটিল না কেন? শুনিয়াছি, মহেশের চরিত্র ভাল ছিল না, তবে কি অপর কোন মন্দ চরিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে? অসম্ভব কি? কিন্তু সে ব্যক্তির অনুসন্ধান কিরূপে করিব? মেসের কেহ ত কুচরিত্র নহে? সদর দরজার খিলান অভগ্ন; এমতাবস্থায় সহজে বাহিরের লোক কিরূপে ভিতরে প্রবেশ করিবে? কিন্তু যদি সদর দরজা সে রাত্রে খোলাই থাকিয়া থাকে, তবে এই এক কথার উপর নির্ভর করিয়া মেসস্থ ছাত্রদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা ত যুক্তিযুক্ত নহে। আচ্ছা, একটা লোক একই বাড়ীতে খুন হইল, আর বাড়ীর অপর কেহই ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না, ইহা বা কি প্রকারের কথা? হত্যাগৃহে একখানা নাগরা জুতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তবে কি হত্যাকারী কোন হিন্দুস্থানী? কিন্তু তাহা হইলে জুতাখানি একেবারে অব্যবহৃত থাকিবার কারণ কি? এ জুতা পায়ে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ত কিছুতেই বোধ হয় না।

মেসের ছাত্র হইতে জানিলাম, একটী ঝি মহেশের কাছে আসা যাওয়া করিত, হত্যার তারিখেও আসিয়াছিল; সে ঝি কে? তাহার সন্ধানের উপায় কি?—এবম্বিধ নানা প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে মনে উদিত ও লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শেষে যখন আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলাম না; কোন্ সূত্রাবলম্বনে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ

করিব, তাহার কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না; তখন অগত্যা তখনকার মত এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আজ রজনীযোগে গুপ্তভাবে মির্জাপুরের সেই ছাত্রবাসে ছাত্রদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতে চেষ্টা পাইব। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা হত্যা ব্যাপারে সংস্পৃষ্ট থাকে কিম্বা এ সম্বন্ধে কিছু পরিজ্ঞাত থাকে, তবে খুব সম্ভবতঃ ইহাদিগের মধ্যে আজ এ বিষয়ের গোপনীয় কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। তখন বোধ হয়, হত্যা সম্বন্ধে কিছু না কিছু সন্ধান পাইতে পারিব।

এইরূপ স্থির করিয়া স্নানাহার সমাপনান্তে শয্যায় পড়িয়া একটু বিশ্রাম ভোগ করিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়িল, এ হত্যা-সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমি এপর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এ তথ্যটী জানিয়া লওয়া আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য;—এই মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক 'ধড়া চূড়া' পরিধান করিয়া পুনরায় মুচিপাড়া থানাভিমুখে রওনা হইলাম।

যথাকালে মুচিপাড়া থানায় পহুঁছিয়া সধ্বকারি ডাক্তারের রিপোর্ট পাঠে যাহা অবগত হবলাম, তাহাতে সন্দেহ আরো বৰ্দ্ধিত হইল। ডাক্তার বলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে হত ব্যক্তিকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে হৃতচেতন করা হইয়াছিল। পরে অজ্ঞানাবস্থায় তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ইহাকে হত্যা করা হইয়াছে। কি ভয়ানক কথা! জীবিতাবস্থায় হত্যা করিলে পাছে আহত ব্যক্তির আৰ্ত্তনাদে অন্যান্য লোক জাগরিত হইয়া পড়ে, এজন্য পূর্ব্বাহ্লে সাবধান হইয়া হত্যাকারী ইহার উপর বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল! হত্যাকারী তবে ত নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহে! মেসেরই কোন ছাত্র কি তাহা হইলে আন্তরিক বিদ্বেষবশে, গুপ্ত কারণে, অপর সকলের অজ্ঞাতে এরূপ সাবধানতা সহকারে হত্যাকাণ্ড সমাধা করিল? সন্দেহ ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল। এ সময়ে একবার মহেশের মৃত দেহ দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না। আমার কলিকাতা পহুঁছিবার বহু পূর্ব্বেই, ডাক্তারের পরীক্ষার পর উক্ত মৃতদেহের সৎকার হইয়া গিয়াছিল।

নানা বিষয়িণী চিন্তার পর অবশেষে আমি প্রথম অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী সুশীল বাবুর সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিলাম। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুশীল বাবু, কি সূত্রে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করিব?" সুশীল বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সূত্র বাহির করিবার জন্যই ত টিকটিকির প্রয়োজন।" সুশীল বাবু ডিটেক্টিভ কে টিক্‌টিকি বলিতেন। আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সেদিন ঘর তল্লাসের সময় কাহারও কাছে ক্লোরোফর্ম আছে কি না, অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি?" সুশীল বলিলেন, "না, আমরা ত তখন জানিতাম না যে হত ব্যক্তির উপর প্রথমে ক্লোরোফর্ম প্রযুক্ত হইয়াছিল।" আমি তখন হাসিয়া বলিলাম "অনুসন্ধানের সকল সুযোগ আমি কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এখন এ অদ্ভুত হত্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া কৃত কার্য্যতার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" ইহার উত্তরে সুশীল বাবু বলিলেন, "ভাল মনে পড়িল;—সে দিন মহেশ চন্দ্রের হাত বাক্স অনুসন্ধানের সময় ইহার ভিতরের কতকগুলি চিঠি পত্র আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, অবকাশাভাবে সে গুলি এ পর্য্যন্ত পড়ি নাই। আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন, যদি কোন সূত্র বাহির হয়।" এই বলিয়া তিনি কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিঠিপত্র আনিয়া আমার সম্মুখস্থ টেবিলে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও তখন আর কিছু করিবার নাই ভাবিয়া সেগুলি হইতে এক এক খানি পত্র লইয়া আগ্রহ সহকারে আপন-মনে পড়িতে লাগিলাম। পাঁচ সাত খানি চিঠির পর একখানি চিঠি পাঠ করিয়া আমি একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। চিঠিখানি অবিকল এই রূপ;—

"—নং হাড়কাটা গলি।
২৬শে আশ্বিন।

প্রাণের মহেশ,

তুমি আর এখন আসিতেছ না কেন? বিধু বাবুর সহিত ঝগড়া করিয়া আমায় পরিত্যাগ করা কি তোমার উচিত? আজ

যা হয়, একটা হইয়া যাইবে। বিধু বাবু বাড়াবাড়ি করিলে, তাহাকে আমার কাছে আসিতে বারণ করিব। আমার কুন্তলীন একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। দেলখোস নামে নাকি এক প্রকার নূতন এসেন্স বাহির হইয়াছে, দেখিতে পাই কি? ঝিকে পাঠাইলাম, তুমি আজ অবশ্য অবশ্য আসিবে, অন্যথা না হয়। ইতি।

তোমারই ভালবাসার

নলি—।"

পত্রখানা দুইবার পড়িয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। পত্রের তারিখ দেখিয়া অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। এ পত্রে ঝির সন্ধান পাইলাম। বিধু বাবু নামে কোন ব্যক্তির সহিত মহেশের মনোমালিন্য ছিল, পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে যেন অনুসন্ধানের কিছু কিছু সূত্র বাহির হইল, মনে করিলাম। আমি আর বিলম্ব না করিয়া ধড়াচূড়া ছাড়িয়া একটী ফিট্ বাঙ্গালী বাবু সাজিলাম। তাহার পর চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া, আমার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত গাড়োয়ানকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পদব্রজে রাস্তায় বাহির হইলাম।

(৩)

হাড়কাটা গলির সেই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। আমি একেবারে 'সপাসপ' উপরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা—সন্ধ্যার প্রাক্কাল। গৃহ কর্ত্রী বেশভূষা পরিপাটী করিতেছে। আমি চির-পরিচিতের ন্যায় একখানা কেদারা টানিয়া বসিয়া পড়িলাম। যুবতী তখন আমার অভ্যর্থনার্থ তাড়াতাড়ি আপন কার্য্য সমাধা করিয়া ঝিকে তামাক আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিল।

আমি ইত্যবসরে আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলাম, "বিধু বাবুর এতক্ষণ এখানে আসিবার কথা ছিল, কই তিনি যে আসিলেন না!" যুবতী উত্তরচ্ছলে বলিল, "কই, সে ত আজ কয়দিন আসিতেছে না। সেই যে সে দিন মহেশের সঙ্গে মারা মা—" এ পর্য্যন্ত বলিয়া যুবতী আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি যেন নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর

করিলাম, "তা কাজটা কি ভাল হয়েছিল? আমি সমস্তই শুনিতে পাইয়াছি। বিধু আমার পরম বন্ধু।

যুবতী। কই, আপনাকে ত একদিনও এখানে দেখি নাই।

আমি। এতদিন আসিবার প্রয়োজন পড়ে নাই; তাই আসি নাই; কিন্তু সেদিনকার ঘটনার পর বিধু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; সে আর কখনও এখানে একাকী আসিবে না।

যুবতী। তা মহাশয়; আমার দোষ কি বলুন? বাস্তবিক; সেদিন মহেশের কাজটা ভারি অন্যায় রকমের হয়েছিল। ভদ্র লোকের গায়ে হাত তোলা, জুতো মারা, এগুলি নেহাত ছোট লোকের কৰ্ম্ম।

এই বলিয়া যুবতী স্বহস্তে প্রস্তুত পানের খিলি দুটী আমাকে প্রদান করিল। আমি সমস্ত ব্যাপার ইতিমধ্যে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার মনে হইতে লাগিল, এ জুতোমারা কাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে বিধু বাবু নামক ব্যক্তির পক্ষে মানসিক উত্তেজনা-প্রাবল্যে মহেশের জীবনলীলা সাঙ্গ করা একেবারে অসম্ভব নহে। ইহা ২৬শে আশ্বিনেরই ঘটনা। যাহা হউক, অধুনা আমার পক্ষে এই বিধু বাবুর অনুসন্ধান লওয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল; কিন্তু এখানে আমি বিধু বাবুর বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছি, সুতরাং সোজাসোজি ইহাকে সেকথা জিজ্ঞাসা না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। ইতিমধ্যে, ঝি-মূর্ত্তি একটী রূপার হুকা হাতে করিয়া সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এবং আমাকে দেখিয়া বলিল,—

"এটী যে নূতন বাবু!" যুবতী তদুত্তরে বলিল "ইনি বিধুভূষণের বিশেষ বন্ধু!"

ঝী। কোন্ বিধুভূষণ?

যুবতী। অ্যাঁ—নেকি? মুখুয্যে বিধু—সেই ২১ নম্বর কলুটোলার।

এতক্ষণে সহজেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে;—আমি ঘটনাক্রমে বিধুর ঠীকানা অবগত হইলাম। সুতরাং আর সেখানে অপেক্ষা করিবার দরকার নাই ভাবিয়া, ঝির কথার উত্তরচ্ছলে অন্যমনস্ক- ভাবে বলিলাম বিধু বাবুর ত এখনই এখানে আসিবার কথা ছিল, দেরী হইতেছে

কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তা, আমি একটু দেখিয়া, আসিতেছি।” এই বলিয়া আমি “২১নং কলুটোলা” ঠিকানাটি মনে রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। এবং অবিলম্বে মুচিপাড়া থানায় আসিয়া পঁহুছিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আমি আসিয়া দেখি, সুশীল বাবু আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিলে, তখনই বিধুর সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত বলিয়া পরামর্শ স্থির হইল। দুই জন পুলিশ কনেষ্টবল, পুলিশ-পোষাক পরিহিত সুশীল বাবু এবং বাঙ্গালী বাবু আমি—শকটারোহণে অগৌণে কলুটোলায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বলিয়া রাখা ভাল, হত্যাগৃহে প্রাপ্ত কাটারি এবং নাগরা জুতা আমাদিগের সঙ্গে লইয়াছিলাম।

তাহাদিগকে গাড়িতে পথের উপর অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি একাকী সেই ২১নং বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। এটী একটী ছোটখাট ডিস্পেন্সারী। অনুসন্ধানে জানিলাম, সুধীর বাবু নামে জনৈক ভদ্র লোক এ ডিস্পেন্সারীর স্বত্বাধিকারী। তিনি সপরিবারে ইহারই উপরতলে বাস করেন, নীচের ঘরে ডাক্তারখানা। আরো জানিলাম, সত্য সত্যই বিধূভূষণ নামে উক্ত সুধীর বাবুর এক ভাইপো এ বাড়িতে বাস করেন। তিনি এক্ষণে বেকার অবস্থায়ই আছেন।

আমি যে সময় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে সময় ডাক্তার বাবু বাসায় ছিলেন না। সুতরাং ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারকে বিধু বাবুকে সংবাদ দিতে বলিয়া নীরবে সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কম্পাউণ্ডার উপরে চলিয়া গেল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে আরক্ত-নয়ন, বিষাদ-বদন, রুক্ষ-কেশ এক যুবক সমভিব্যাহারে সে কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। যুবকের মুখাকৃতি ও ভাবগতি সন্দর্শনে আমার মনের দারুণ সন্দেহ একেবারে বিশ্বাসে পরিণত হইল।

আমি একটু ত্রস্ততার সহিত অথচ মৃদুস্বরে যুবককে বলিলাম, “আমি হাড়কাটা গলি হইতে আসিয়াছি। পথে গাড়ীতে ‘নলি’ অপেক্ষা করিতেছে, আপনি একটু বাহির হইতে পারেন?” যুবক

সংক্ষেপে উত্তর করিল "আমি আজ বড় অসুস্থ।" আমি তখন ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "তবে আপনি একটু এখানেই অপেক্ষা করুন, আমি তাহার নিকট হইতে এই আসিতেছি।" এই বলিয়া ত্বরিতপদে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, এবং কয়েক মুহূর্ত্তের পর দলবলসহ সুশীলকে সে বাড়ীতে উপস্থিত হইতে উপদেশ দিয়া, পুনরায় ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিলাম। এবারে তাড়াতাড়ি আসিয়াই আমি দৃঢ়মুষ্টিতে বিধুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই নাগরা জুতাখানি বাহির করিয়া বলিলাম, "দেখ দেখি বিধু, তুমি এ জুতা সেদিন রাত্রিকালে মহেশের হত্যাগৃহে ফেলিয়া আসিয়াছিলে কি না!"

আমার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা পাইল। তখন আমি আমার মুষ্টি দৃঢ়তর করিয়া বলিলাম, "সে চেষ্টা বৃথা; তুমি মহেশের হত্যাকারী, তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।

ইত্যবসরে কনেষ্টবলসহ সুশীল বাবু সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে, এক্ষণে থানায় চলুন।"

বিধু এ সকল দেখিয়া-শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলাম, "দেখ, বিধু, আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি; তুমি হাড়কাটা-গলিতে 'নলির' বাড়ী মহেশ কর্ত্তৃক প্রহৃত ও অবমানিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে, উত্তেজনাবশে, সেদিনই মহেশকে খুন করিয়াছ। এ বিষয়ের সমস্ত প্রমাণাদি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে চল, তোমাকে হাজতে লইয়া যাইব।"

আমি এতটুকু বলিয়া দেখিলাম, বিধু আমার সমস্ত কথা শুনিতেছে কি না সন্দেহ। কারণ, ক্রমে যেন তখন তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল।

তদনন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধু, তুমি এক্ষণে কি বলিতে বা করিতে চাও?" সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে উত্তর করিল, "মহাশয়, আমার কিছু বলিবার বা করিবার নাই। পাপ গোপনে

থাকে না। পাপের ফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে; চলুন, আমি কোথায় যাইব।”

আমি বলিলাম, “তুমি হত্যাপরাধ স্বীকার করিতেছ?” সে উত্তর করিল, “আর মিথ্যা বলিব না; আমি হত্যা করিয়াছি।”

আমরা সেখানে বসিয়াই উপস্থিত কতিপয় ভদ্র লোক সমক্ষে বিধুর স্বীকারোক্তি এবং তৎকর্ত্তৃক বর্ণিত হত্যার আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

অবমানিত হইয়া, উত্তেজনা-বশে যে এ ভীষণ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল; মহেশ যাহাতে চীৎকার করিতে না পারে, তজ্জন্য যে পূর্ব্বাহ্নেই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিয়াছিল; অনুসন্ধানকারীকে বিপথে চালিত করিবার জন্য যে হত্যাগৃহে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নাগরাজুতা রাখিয়া আসিয়াছিল, একে একে এ সমস্তই বিধু স্বীকার করিল। এইরূপে বিধুর জমানবন্দী সমাপ্ত হইলে আমরা তাহাকে থানায় লইয়া চলিলাম।

বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত-হত্যার মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ হইল, এবং দায়রায়, জজ সাহেব ও জুরির বিচারে, বিধুভূষণ চিরনির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

শ্রীরজনীচন্দ্র দত্ত।
হেড্‌মাষ্টার, বেজুড়া স্কুল, (শ্রীহট্ট)।



দ্বিতীয় পুরস্কার ২০৲

অদল বদল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সে আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা; কার্ত্তিক মাসের শেষে একদিন আমি বেলা বারোটার সময় যথারীতি আফিসে আসিয়া বসিতেই চাপড়াস বদ্ধ এক হিন্দুস্থানী মুসলমান মূর্ত্তি আমার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল 'বড়া সাহেব আপকো সেলাম দিয়া বাবুজি!' বড় সাহেব আমাদের ডিটেকিট্ভ পুলিশের স্থপারিণটেন্‌ডেণ্ট; আমি তখন সবে ডিটেকিটভ্ ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করিয়াছি; আমি ডিটেক্‌টিভের সবইন্‌স্পেক্টর, বাঙ্গালায় যাকে বলে 'গোয়েন্দা দারোগা'।

বড় সাহেব আমার উপর কিছু প্রসন্ন ছিলেন; অল্প দিনের মধ্যে আমার কিঞ্চিৎ স্থনামও জন্মিয়াছিল; এবং কোন জটিল মকদ্দমা তদন্ত করিবার আবশ্যক হইলে; অনেক সময় সিনিয়ার দারোগার পরিবর্ত্তে আমার উপরই তদন্তের ভার পড়িত। আজও সেইরকম একটা কিছুর প্রত্যাশা করিয়া বড় সাহেবের 'আফিস রুমে' প্রবেশ করিলাম।

সাহেব তখন মাথা গুঁজিয়া কি লিখিতেছিলেন; আমার গৃহপ্রবেশ মাত্র সাহেব এক চোখের চসমার ভিতর দিয়া একবার আমার দিকে চাহিলেন; এবং কোন কথা না বলিয়া বাম হস্তে আমার সম্মুখে একখান বাঙ্গালা খবরের কাগজ ফেলিয়া দিলেন; আমি তাহা কুড়াইয়া লইয়া খুলিলাম; নাম দেখিলাম 'সদর ও মফঃস্বল'; ইহা কলিকাতা কিম্বা মফঃস্বলের কোন নগর হইতে বাহির হয় কি না জানি না; এখন পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে কি না জ্ঞাত নহি; ইহা 'সঞ্জীবনী' অপেক্ষা কিছু ছোট আকারের সাপ্তাহিক পত্রিকা, এ কাগজ সর্ব্ব প্রথম এই

দেখিলাম। প্রথম পৃষ্ঠা উলটাইতেই, 'সম্পাদকীয় মন্তব্যের' নীচে নীল পেন্সিলের মোটা দাগ দেওয়া একটা প্যারা আমার নজরে পড়িল, বুঝিলাম ইহাই দেখিবার জন্য সাহেব কাগজখানি আমায় দিয়াছেন, আমি প্যারাটি আগাগোড়া পড়িলাম ;—

"মালদহের বঙ্কুবিহারী সাহা নামক একজন হাতুড়ে 'কুন্তলীন' নামক বিখ্যাত কেশ তৈলের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া লাভবান হইবার আশায় 'কুন্তলীনের' নামের অনুকরণে 'কুন্তল তৈল' নামক এক প্রকার কেশ তৈল প্রস্তুত করিয়াছে, আমরা এই তৈল ব্যবহার করিবার জন্য এক শিশি উপহার পাইয়াছি, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ইহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই ইহার অসাধারণ গুণের কথা অবগত হইয়াছি। এই তৈল ব্যবহার করিয়া দুই জন লোক ভব-যন্ত্রনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর দুই জন লোক শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে, ডাক্তার সাহেব সযত্নে চিকিৎসা করিতেছেন, রোগীদ্বয় বাঁচিবে কি না এখনো বলা যায় না ; নিজ মালদহ হইতে আমরা এ সংবাদ পাইয়াছি, বঙ্কু সাহার 'কুন্তল তৈল' আর কোথাও কোন বিভ্রাট ঘটাইয়াছে কি না তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই। আমরা সংবাদ পাইলাম বঙ্কু সাহার নামে ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার পূর্ব্বেই সে চম্পট দিয়াছে, পুলিশ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই।"

সংবাদটা দুইবার মনে মনে পড়িলাম। তাহার পর কাগজ খানা ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখিয়া সাহেবকে বলিলাম "কিছু বুঝিতে পারিলাম না, বঙ্কু সাহা হাতুড়ে সন্দেহ নাই; হাতুড়েদের মতই হয়ত সে কাণ্ডজ্ঞান হীন মূর্খ এবং হয়ত এই তৈলের বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ইহা বিষাক্ত হইয়াছে; কিন্তু এমন বিষাক্ত হইল যে তাহা মাখিয়াই দুইটা মানুষ মরিয়া গেল? আর দুজন মর মর; তৈলে যে এমন কোন উগ্র বিষ ছিল তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ?"

সাহেবের লেখা শেষ হইয়াছিল, তিনি চেয়ার খানা অল্প ঘুরাইয়া লইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অল্প হাসিয়া বলিলেন,

"আমিও কিছু না বুঝিতে পারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে একখান অফিসিয়াল পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি উত্তরে লিখিয়াছেন তৈলে যে উগ্র উদ্ভিজ্জ বিষ বর্ত্তমান, পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের পাকাশয় Chemical Examiner এর কাছে পাঠান হইয়াছিল, পাকাশয়ে এই বিষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল।

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম, বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, পাকাশয়ে বিষ পাওয়া গিয়াছে! তাহা হইলে আপনি বলিতেছেন তৈল মাখিয়া ইহারা মরে নাই, খাইয়া মরিয়াছে?"

সাহেব বলিলেন, "কাণ্ডটা আমার নিকটও আগাগোড়া রহস্য পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। সমস্ত ঘটনার full report আমি পাই নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্ক সাহাকে ধরিবার জন্য একজন expert ডিটেক্টিভ নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন,—বুঝিয়াছ তোমাকে ডাকিয়াছি কেন?"

এ সম্বন্ধে সাহেবের সঙ্গে আমার আরও দুই চারিটা কথা হইল। তাহার পর সাহেব সহসা ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন,—তোমাকে আজই লুপ মেলে যাইতে হইবে। আর দু ঘণ্টা মাত্র সময় আছে, এখন গুড্‌বাই। টুপিটা মাথায় তুলিয়া সাহেব কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন, আমিও আর বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিলাম।

লুপমেল বেলা সা তিনটার সময় হাবড়া ছাড়ে; আমি তাড়াতাড়ি বাসায় আসিয়া দরকারী কয়েকটা জিনিষ মাত্র একটা ট্রঙ্কে পুরিয়া হাবড়া রওনা হইলাম। ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী ছাড়িতে মিনিট দশেক মাত্র সময় ছিল, জিনিষপত্র গুছাইয়া গাড়ীর মধ্যে একটু ভাল করিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল, গার্ডের হুইস্‌লে শিশ দেওয়া হইল, এবং প্ল্যাটফর্ম্ম কম্পিত করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে ট্রেণ ছুটিয়া চলিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় রাজমহলে উপস্থিত হইলাম। সেই রাত্রেই ডাকের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আমি গো-শকটের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। গাড়ীর খোঁজ করিতেছি শুনিয়া পাঁচ সাত জন গাড়োয়ান আসিল, এবং আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় এক

সঙ্গে সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁহা জানে হোগা সাব রাঁংরেজা?" 'রাঁংরেজা' কিরে বাপু? শেষে বুঝিলাম, ইংরেজবাজার বা ইংরেজাবাদ, মালদহের সিভিল ষ্টেসন ইহাদের নিকট এই সংক্ষিপ্ত নামে পরিচিত। পাঁচ সিকা মাত্র দিয়া আমি রাঁংরেজার জন্য গাড়ী করিলাম। গাড়োয়ান আমার বিছানা বিছাইয়া দিলে, ধূলিধূসর মস্তকটি উপাধানে ন্যস্ত করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকাল বেলা যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখি প্রভাত রৌদ্রে মুক্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত, ধীরে ধীরে শীতল বাতাস বহিতেছে, গাড়ী প্রশস্ত পথ বহিয়া মন্থর গতিতে চলিতেছে, পথের উভয় পার্শ্বে মাটির উঁচু আইল দেওয়া তুতের ক্ষেত, আমের বাগান, পাখীর কলগান, বনের ছায়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন কৃষক কুটীরে বালক বালিকার হর্ষ কল্লোল, আর অনেক দূরে ধূসর গিরি শ্রেণীর উপর প্রাতঃ-সূর্য্যের দীপ্তালোক, আমি গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিলাম।

বেলা তিনটার সময় মালদহ আসিয়া পৌঁছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে মালদহে আসিয়া কোন অপরিচিত ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয় নাই, আমার বাল্য-বন্ধু কমলকৃষ্ণ বাবু সে সময় মালদহের ডিস্‌টিলারি সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার স্কন্ধেই ভর করিলাম। তিনি আমাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলেন। অপরাহ্ণে স্নানাহার শেষ করিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, আমি আমার এই আকস্মিক অভিজানের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। দেখিলাম তিনি বক্সু সাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন; আমাকে কৌতূহলাক্রান্ত দেখিয়া তিনি তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলেন, আমি বলিলাম, "তাহার সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছ আগাগোড়া বল।"

কমলকৃষ্ণ বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"বক্সু সাহার অবস্থা এমন ছিল না যে আমি তাহার বিষয়ে কোন খবর রাখি, তবে তাহার পলায়নের পর বিষয়টা কিছু

interesting হইয়া উঠায় দিগম্বর বাবুর কাছে কথা প্রসঙ্গে যাহা শুনিয়াছি তাহাই তোমাকে বলি; দিগম্বর বাবু আমাদের এ অঞ্চলের একজন বড় জমিদার, প্রথম যৌবনে বঙ্কু তাঁহার একজন মোসাহেব ছিল; তাঁহাদেরই গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে সে কিছুদিন পড়িয়াছিল, কিন্তু সরস্বতীর অকৃপাবশতঃ ছাত্রবৃত্তি পাশ করিতে পারে নাই, অবশেষে সে মালদহে আসিয়া 'সারদাসুন্দরী (দিগম্বরের মাতার নাম) দাতব্য চিকিৎসালয়ের' কম্পাউণ্ডারের এসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হয়; কিছু দিন এসিষ্টাণ্টগিরি করিয়া দিগম্বর বাবুর অনুগ্রহে তাহার কম্পাউণ্ডারের চাকরীটি লাভ হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল তাহার চাকরী করা পোষাইয়া উঠিল না, সে সর্ব্বদাই বলিত, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কখন চাকরী করিয়া পোষায় না, প্রতিভা বিকাশই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সে চাকরী ছাড়িয়া আবিস্কার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিল, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে নাকি সর্ব্বদা সার্ হম্‌ফ্রে ডেভি বা ক্রিষ্টোফার কলম্বস জন্মগ্রহণ করে না, তাই বেচারার আবিস্কারের মধ্যে তেমন originality ছিল না, অর্থাৎ সে যখন দেখিল প্রতিভা খাটাইয়া কিছু আবিস্কারও করা চাই সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনও চাই, তখন আর কিছু আবিস্কারের সুবিধা না পাইয়া 'কুন্তল-তৈল' নামে একটা কেশ-তৈল আবিস্কার করিয়া ফেলিল। বোধ হয় কুন্তলীনের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া ও তাহার খ্যাতির কথা শুনিয়া সে ইহার নামের অনুকরণে নিজের তৈলের নাম রাখিয়াছিল, এরকম অনুকরণ আজ কাল আমাদের দেশের একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক শুধু এই তৈল আবিস্কার করিয়া ক্ষান্ত হইলেই হয় ত বেচারীকে কোন বিপদে পড়িতে হইত না, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা নিরীহ লোকের প্রাণও যাইত না।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"বল কি তুমি, তাহা হইলে কি সে তৈল বিষাক্ত নয়? আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি এ তৈলে উগ্র উদ্ভিজ্জ বিষ বর্ত্তমান আছে।"

কমলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "আরে ভাই কথাটা শোনই, অনেক রহস্য আছে, বুঝিতেছ না মাখিবার তেল খাইয়া মানুষ মরিয়াছে, বিষ থাক বা না থাক, মাখিবার তেল আর কে খায়?"

আমি বলিলাম, "তোমার গল্প শেষ না হইলে আর এ রহস্যের অন্ত পাইতেছি না, —বল।"

কমলকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

"বঙ্ক সাহা শুধু তৈল প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, ভাবিয়া চিন্তিয়া পেটের ব্যারামের একটা পেটেণ্ট মেডিসিন বাহির করিল, তাহার নাম দিল উদরাময়ের মহৌষধ। এই মহৌষধের আর কোন গুণ ছিল কি না জানি না, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর আঠালো যে তাহা আর কহতব্য নয়, বোধ করি এই মহৌষধ দিয়া ভাঙ্গা কাচও যোড়া দেওয়া চলে। এ পরিচয় আমরা পরে পাইয়াছি, সেই কথাই এখন বলিব।

তৈল ও উদরাময়ের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া বঙ্ক সাহা তাহার ভূতপূর্ব্ব মনিব 'সারদাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়ের' ও দিগম্বর বাবুর পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার কে, সি, দত্ত এম্, আর্, সি, পি (এডিন) মহাশয়ের নিকট দুই শিশি উপহার পাঠাইল, এবং তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইল যে যদি তিনি এই তৈল ও মহৌষধের উপকারিতা সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট দেন তাহা হইলে তাহার মহোপকার হয়। ডাক্তার জানাইলেন, ইহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তিনি সার্টিফিকেট দিবেন ; শিশি দুটি আপাততঃ তাঁহার নিকট রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলকৃষ্ণ বলিলেন,—"এই ঘটনার তিন দিন পরে মালদহের সেসন বসিল। রাজসাহীর সেসন জজ সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া দাওরা করিতে আসিলেন। দেখিতে দেখিতে বিচারালয় সজীব হইয়া উঠিল, দাওরা আরম্ভ হইবার দিন আদালতের সম্মুখবর্ত্তী সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ মূল ও অদূরবর্ত্তী ছায়াচ্ছন্ন আম্র তরুতল উকীল, মোক্তার, সাক্ষী, আসামী ও ফরিয়াদী পক্ষীয় লোক, স্কুলের ছাত্র, দোকানদার সর্ব্বশ্রেণীর জন সমাগমে এক বৃহৎ হাটের আকার ধারণ করিল, এরূপ হইবার বিশেষ কারণও ছিল, জন আরবথনট কোম্পানীর সহিত জমিদার দিগম্বর বাবুর একটা হাটের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়; এক দিন হাটে

উভয় পক্ষীয় লোকই উপস্থিত ছিল, কথায় কথায় তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল, প্রথমে মুখে মুখেই চলিতেছিল, শেষে লাঠি চলিতে লাগিল, আরবথনট কোম্পানীর এক পাইকের লাঠিতে দিগম্বর বাবুর একটা লাঠিয়ালের মাথা ভাঙ্গিয়া যায়, সেই আঘাতেই বেচারা মরিয়া গিয়াছে। দাওরার প্রথম দিনই এই মকদ্দমার বিচার হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল, উভয় পক্ষই প্রবল, কলিকাতা হইতে দুই পক্ষই বড় বড় ব্যারিষ্টার আনাইয়াছেন। পেটা ঘড়িতে ঢন্ ঢন্ করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল, কনেষ্টবল বেষ্টিত আসামী 'কাঠগড়ার' মধ্যে আনীত হইল, জজ সাহেব খাস কামরা হইতে বাহির হইয়া বিচারকের আসনে উপবেশন করিলেন, ব্যারিষ্টার সাহেবেরা আসিয়া বিচারালয়ের বিভিন্ন কাষ্ঠাসন শোভিত করিয়া বসিলেন, এবং সামলা মাথায় দিয়া সরকারী উকীল বিচার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে সরকারী উকীল মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। মকদ্দমার ফরিয়াদী পক্ষের কয়েকজন প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে, একজন বড় রকমের সাক্ষীর সময় আসিল, এই সাক্ষী আর কেহ নহে, দিগম্বর বাবুর পারিবারিক চিকিৎসক মিঃ কে, সি, দত্ত, এল্, আর্, সি, পি মহাশয়।

কিন্তু এখনও তিনি উপস্থিত হন নাই, একে বিলাত ফেরত ডাক্তার, তাহার উপর আবার এল্, আর্, সি, পি (এডিন), মামলা মকদ্দমার তিনি তোয়াক্কাই রাখেন না, কিন্তু সেসন আদালতের কথা স্বতন্ত্র, তাহার উপর হাকিম যেরকম কড়া, খাতির না করিয়া উপায় নাই। কোর্টে যখন তাঁহার উপস্থিত হওয়ার দরকার ঠিক সেই সময়টিতে তিনি হ্যাট কোটে পরিশোভিত হইয়া, তাঁহার ডগকার্ট খানিতে করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন।

এখানে দত্ত সাহেবের কথা তোমাকে একটু বলি ; তাঁহার একটু প্রাকৃতিক বিকৃতি জন্মিয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ সহধর্ম্মিনীর নব-যৌবন বর্ত্তমানেই পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মস্তকের সম্মুখের নিবিড় কেশ রাশি উঠিয়া গিয়া দুই চারি গাছি মাত্র চুল মরুভূমে ওয়েশিসের

মত বিদ্যমান ছিল। বঙ্কু সাহা তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল যেন তাহার আবিস্কৃত কুন্তল তৈল যথারীতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তাহার লুপ্ত কেশরাজি অঙ্কুরিত হইয়া তাঁহার অনুর্ব্বর মস্তক সুশোভিত করিবে। কাছারীতে সাক্ষী দিতে যাইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বঙ্কু সাহার সেই তৈলের কথা তাঁহার মনে পড়িল, শিশিটা তখনও খোলেন নাই, মনে করিলেন 'তৈলটা একটু মাথায় লাগাইয়া যাই না কেন?' শিশি বাহির করিয়া চাকরকে সেই তৈল তাঁহার মাথায় উত্তমরূপে লাগাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। চাকরটা শিশির কর্ক খুলিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ তরল পদার্থ তাঁহার মস্তকের উপর উত্তমরূপে অনুলিপ্ত করিয়া দিল। অতঃপর তিনি মস্তকে হ্যাট আঁটিয়া কাছারীতে সাক্ষ্য দিতে চলিলেন।

আমি তোমাকে একটা কথা এতক্ষণ বলি নাই, বঙ্কু সাহা যে কুন্তল তৈল ও উদরাময়ের মহৌষধ আবিস্কার করিয়াছিল, তাহাদের শিশি ঠিক এক রকমের, শুনিয়াছি শিশির উপর লেবেল লাগাইবার ভার দিয়াছিল একটা নিরক্ষর চাকরের উপর, চাকরটা লেবেলগুলা অদল-বদল করিয়া ফেলিয়াছিল, অর্থাৎ কুন্তল তৈলের লেবেল উদরাময়ের মহৌষধের শিশিতে লাগাইয়াছিল, আর মহৌষধের লেবেল লাগাইয়াছিল তৈলের শিশিতে; ইহাতে যে ফল ফলিল তাহা বুঝিতেই পারিতেছ, কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি উদরাময়ের মহৌষধটা ভয়ানক আঠালো জিনিস। কাজেই সেই আঠালো উদরাময়ের মহৌষধ অতি পরিপাটিরূপে দত্ত সাহেবের মস্তকে লিপ্ত হইল।

কোর্টের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি হ্যাট খুলিবেন, উঠাইতে গিয়া দেখেন তাহা মাথার উপর আঁটিয়া বসিয়াছে। এরূপ অলৌকিক ঘটনার কারণ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি আর একবার হ্যাটের এক কোণ ধরিয়া সজোরে টান দিলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! শিরীষের আটা বরং ভাল, বিস্তর টানাটানিতে হ্যাট একটুও নড়িল না, এদিকে টাকের উপর ঔষধ শুখাইয়া চামড়ায় টান ধরিয়াছে, মাথা চুলকাইবার

জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু হায়, হিমাচলের অভ্রভেদী শিরে চির বরফস্তূপের মত তাঁহার মস্তকে সোলা-হ্যাট অটুট রহিল।

এ দিকে আর সময় নাই, তাঁহার আগের সাক্ষী অনেকক্ষণ সাক্ষীর 'কাটরা' হইতে নামিয়া গিয়াছে, অগত্যা তিনি হ্যাট মাথায় দিয়াই সাক্ষীর কাটরায় উঠিলেন; দেখিয়া অনেকে পূর্ণ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিল, কারণ হ্যাট মাথায় দিয়া কোন সাহেব বা বাঙ্গালীকে সাক্ষী দিতে আর কখনও তাহারা দেখে নাই।

জজ সাহেবটি কিছু অতিরিক্ত রোখা, সাক্ষীরা তাঁহার হস্তে নিগ্রহ ভোগ করে বলিয়া একটা জনরব ছিল। জজ সাহেব ডাক্তারের মাথায় হ্যাট দেখিয়া তৎপ্রতি দুই একবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ পাত করিলেন, কিন্তু ডাক্তারকে যখন হ্যাট অপসারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিলেন, তখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"আদালত গৃহে মাথায় হ্যাট রাখা নিয়ম বিরুদ্ধ এ কথা একজন শিক্ষিত সাক্ষীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া লজ্জাজনক।"

ডাক্তারের গলদঘর্ম্ম হইতেছে, তিনি বুকের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ললাটের ঘর্ম্ম অপসারণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি ইচ্ছা করিয়া মাথায় হ্যাট রাখি নাই, আমার—"

সাহেব—"আপনার ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক কোর্টে আপনার মস্তক উন্মুক্ত করিতে হইবে, ভারতেশ্বরীর বিচারাসনের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিবার আপনার অধিকার নাই।"

ডাক্তার—"আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা—"

সাহেব এবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কথা কোর্টের জানিবার কোন আবশ্যক নাই, আপনি এই মুহূর্ত্তে হ্যাট খুলিবেন কি না?"

ডাক্তার—"কি বিপদ, কোর্ট কি আমার কথাটা—"

জজ সাহেব—ইহা নিতান্ত বেয়াদবী! আমি আপনার কোন কথা শুনিতে চাহি না, আগে মাথা খুলুন, পরে কথা; আর যদি বিন্দু মাত্র বিলম্ব করেন, তবে আমি আপনাকে—

ডাক্তার আবেগের সহিত বলিলেন, "মহাশয়, আমার কৈফিয়ৎটা শুনিয়া—"

জজ সাহেব এবার ব্লটিংএর রূলটা টেবিলের উপর আছড়াইয়া সক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"চাপড়াসী, আবি উস্‌কো টোপী জোরসে উতার লাও, পেস্কার, আমি ইহাকে আদালত অবজ্ঞার জন্য কুড়ি টাকা জরিমানা করিলাম।

পেস্কার জরিমানার ওয়ারেণ্ট লিখিতে বসিল। চাপড়াসী হুজুরের হুকুমে ডাক্তার সাহেবের হ্যাট খুলিবার জন্য সাক্ষীর কাটরার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু ভীমকান্তি ডাক্তার সাহেবের বিরাট ঘুসি উত্তোলিত দেখিয়া আগাইতে ভরসা করিল না, এখন তাহার অবস্থাটা অনেক পরিমাণে

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ
সীতার হরণে যথা মারীচ কুরঙ্গ।"

একদিকে জজ সাহেবের হুঙ্কার, অন্যদিকে ডাক্তারের ঘুসি, দুইটাই সমান আতঙ্কজনক—চাপড়াসী বেচারা প্রমাদ গণিল।

জজ সাহেব তাঁহার হুকুম তামিল হইল না দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন, চাপড়াসীর দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিলেন—"চাপড়াসী—গাধা, সুয়ার, তোমারা কাণ্ডর হ্যায়, জোরসে নেকালো উস্‌কে টোপী, আবি নেকালো, পেস্কার, আমি সাক্ষীকে আরো পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলাম।

একে ত ভারি ধুমধামের মকদ্দমা, তাহার উপর বড় বড় ব্যারিষ্টার আসিয়াছে; পূর্ব্বেই বলিয়াছি সহরের অধিকাংশ লোক আসিয়া জড় হইয়াছিল, বিচারের মধ্যপথে বিচার গৃহে এই প্রহসন আরম্ভ হওয়ায় ঘরের দ্বার ও বারান্দায় আর তিল ফেলিবার স্থান রহিল না, সকলের দৃষ্টি ডাক্তারের উপর, ব্যাপার দেখিয়া সকলেই শশব্যস্ত, কিছু বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্ময়াকুল। ডাক্তার সাহেব কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে এরূপ অপমানিত হইয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন, তাঁহার চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল, ললাট বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে

লাগিল, তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল, জজ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"পঞ্চাশ কেন, আপনি এই মুহূর্ত্তে পাঁচশো টাকা জরিমানা করুন না কেন, জরিমানার ভয়ে কে কখন অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিতে পারে? আপনি শুধু রাগই করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন না যে হ্যাটটি আমার মাথায় কায়েমীভাবে বসিয়া গিয়াছে; আমি চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, কিন্তু হাজার টানাটানিতেও ইহা খুলিবে না। যাহা হউক আমি আপনার আক্ষেপ রাখিব না, দেখুন ইহা অন্য উপায়ে খুলি।" বলিয়া দত্ত সাহেব পকেট হইতে একখানা ছুরী বাহির করিলেন, এবং তাহা খুলিয়া সোলা-হ্যাটের উপর তাহার অগ্রভাগ বসাইয়া জোরে টানিলেন, তাহার পর সেই ফাঁকে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া সজোরে টানিতে লাগিলেন, সোলা-হ্যাটের ক্ষুদ্র প্রাণ সে বিষম টান সহ্য করিতে পারিল না পড় পড় শব্দে মাথার উপর হইতে হ্যাট উঠিয়া আসিল, মাথায় লুপ্তাবশিষ্ট যে দুই চারি গুচ্ছ কেশ বর্ত্তমান ছিল এই বিপুল টানে তাহাদেরও অস্তিত্ব লোপ পাইল, এবং হ্যাটের এক পরদা সোলা টাকটি জুড়িয়া বিরাজ করিতে লাগিল, কি রকম শোভা হইল কিছু অনুমান করিতে পার?" কমলকৃষ্ণ হাসিয়া আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমিও হাসিয়া উত্তর করিলাম, "তাহা আর পারি না?"
'ছাদিতা শরদভ্রেণ শশি লেখেব দৃশ্যতে', তার পর?

"তাহার পর আর কি? হাসির গররা পড়িয়া গেল; সাক্ষী দেওয়া শেষ হইলে ডাক্তার অগ্নি-মূর্ত্তিতে আদালত হইতে বাহির হইয়া বন্ধু সাহাকে তেলের সার্টিফিকেট দিবার জন্য ঘোড়ার চাবুক হাতে করিয়া ছুটিলেন, বন্ধু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার সার্টিফিকেটের হাত হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইল। ডাক্তার মাথার পঙ্কোদ্ধার করিতে তিনখানা 'ভিনোলিয়া সোপ' খরচ করিলেন, মাথার গরম দূর করিবার জন্য মাথায় দু বোতল 'কুন্তলীন' মালিশ করিতে হইয়াছিল, ইহার পর বোধ করি তাঁহার মাথা কিছু ঠাণ্ডা হইয়াছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কমলকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "ডাক্তারের এই ঘটনার পরদিন পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের ওভারসিয়ার মাথা ও ঘাড় উত্তমরূপে চাদর দিয়া ঢাকিয়া আমার বাসার কাছ দিয়া যাইতেছিল, তখন বেলা আটটার বেশী হয় নাই; আমি তাহাকে ডাকিয়া তামাক খাইতে বসাইলাম, দেখি বেচারা মাথায় পাকড়ি '&' হইয়া ঘাড় উচু করিয়া বসিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তোমার মাথায় কি কোন রকম বেদনা হইয়াছে, না ঘাড়ে ফিক্ লাগিয়াছে? ওরকম করিয়া চাদর জড়াইয়াছ কেন?' ওভারসিয়ার বলিল, 'মহাশয় দুঃখের কথা আর কি বলিব, বঙ্কু সাহা নামক একটা হাতুড়ে এই সহরে 'কুন্তল তৈল' নামে একটা তেল আবিষ্কার করিয়াছে। কাল রাত্রে তাহাই একটু মাথায় দিয়া শুইয়াছিলাম, মধ্যে মধ্যে আমার মাথাটা ঘোরে, ভাবিলাম, তেলটা বোধহয় ভাল, সস্তাও বটে। তেলটা মাথায় মালিশ করিবার সময় আমার চাকর বলিল 'ভারি আঠালো তেল', আমার দুর্ব্বুদ্ধি! আমি বলিলাম, 'আঠালো হোক, ভাল করে মালিশ কর।' সে মাথার কাছে আধ ঘণ্টাটেক বসিয়া মালিশ করিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম; সকাল বেলা উঠিয়া দেখি, বালিশটা মাথার সঙ্গে দিব্য জোড়া লাগিয়া গিয়াছে, কষ্টে স্বষ্টে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, বালিশটাও যিশুখৃষ্টের ক্রুশ কাষ্ঠের মত মাথার সঙ্গে আড় হইয়া বাধিয়া উঠিল। কি করি, অনেক বিবেচনার পর খোল হইতে বালিশটা খুলিয়া ফেলা হইল, কিন্তু ওয়াড় ত মশায় আর কিছুতে মাথা ছাড়িতে চায় না, বিস্তর টানাটানি করিয়া দেখা গিয়াছে, আর এ বেশে বাহিরই বা হই কি করিয়া? অগত্যা ঘাড়ে মাথায় চাদরটা জড়াইয়া একবার সেই 'রাসকেলের' কাছে যাইতেছি, অবস্থাটা একবার তাহাকে দেখাইয়া আসি। এমনি রাগ হইতেছে, বেটাকে ঘা কত দিয়া আসি আর বলিয়া আসি যে যদি আমার মাথার এ আটা না ছাড়াইয়া দেয় ত তার নামে ক্ষতি পূরণের মোকর্দ্দমা আনবো।"—ওভারসিয়ার চলিয়া গেল, কিন্তু বঙ্কু সাহার যেরকম সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে হাজির পাওয়া

সহজ হইল না। ইহার দিন কয়েক পরে যখন তাহার ‘কুন্তল তৈল’-রূপি ‘উদরাময়ের মহৌষধ’ সেবন করিয়া দুই জন লোক মরিল, আর দুই জন সরকারী ডাক্তার থানায় আসিয়া মরণাপন্নভাবে তিন চারি দিন কাটাইয়া ডাক্তারের বিশেষ চেষ্টায় বাঁচিয়া উঠিল, তখন চারি দিকে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, তাহাকে arrest করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যে সে কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে, পুলিশের সাধ্য নাই যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহার অন্তর্ধানের পর তাহার বাসাখানা তল্লাসী করা হইয়াছিল, পাওয়া গিয়াছে কি জান? গোটা কত কেরোসিনের বাক্স, একখানা ভাঙ্গা চৌকি, সরলজ্বর চিকিৎসা, বিসূচিকা দর্পণ, বৈজ্ঞানিক সামগ্রী প্রস্তুতের সহজ উপায়, প্রভৃতি কয়েকখানা পুঁথি, আর তাহার মহৌষধ কয়েক ডজন, এ সকল জিনিস এখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নাজিরের জিম্বায় আছে। এ সকল জিনিষ যখন লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহার তুলো বাহির করা ময়লা বালিশটার নীচে দুখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে, পত্র দুখানা ভারি মজার, দেখিতে ইচ্ছা কর ত কাল এক সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাইও, হেড্ ক্লার্কের কাছ হইতে লইয়া দেখাইব।”

পরদিন কোর্টে গিয়া পত্র দুখানি দেখিয়া আসিলাম, দেখিলাম একখান বহরমপুর হইতে আর একখান বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছে। আমি হেড্ ক্লার্ককে বলিয়া একটা কাগজে পেন্সিল দিয়া পত্র দুখানা নকল করিয়া লইলাম। বর্দ্ধমানের পত্রখানি এইরূপঃ—

মার্ণবরেষু।

মহাসয়, এই কলীজুগে হরেক রকম জুআচুরির কতা হামেসা স্রেবন করিআ আসিতেছি। কিন্তুক এ রকম জুআচুরি এই প্রেথম দেখিলাম। অন্য জুআচোরেরা ধন লইয়া খ্যান্ত হয় কিন্তুক আপুনি প্রান পর্য্যান্ত নষ্টো করিবার উপক্রোম করিআছেন। আমার মাতা ঠাকুরানি কিছু কাল জাবদ পেটের পীড়েয় কষ্টো পাইতেছিলেন, বিধায় আপনার উদরাময়ের মহোসদের বিজ্ঞাপন দ্রিষ্টে ঐ মহোসদ আনা-

ইআ তাহাকে সেবন করিতে দিই, একবার সেবনের পর পীড়ে উপসোম হওোয়া দুরের কথা তিনী ক্রেসা তো ভেদ বমীতে অস্থির হইআ পড়িলেন, অগত্যে ঔসদ বন্দ করিআছি। যাহা হইবার হইআছে, মাতাঠাকুরানি পুন্ন পুন্নিফলে এ জাত্রা রইখো পাইআছেন, আমার কাছে ফাকী দিআ যে দাম আদায় করিআছেন, পত্রোপাট তাহা ফেরত পাঠাইবেন, নচেৎ আমী বঙ্গোবাসী পত্রিকায় আপনার জুআচুরির কতা প্রেকাশ করিআপত্রো লিখিবো জানিবেন, অধীক লেখা বাহুর্ল ইতি—

নিঃ শ্রীনিত্রানন্দ পরামাণিক।

দ্বিতীয় পত্রখানি আরো অদ্ভুত, ভাষা এত পরিশুদ্ধ না হইলেও ইহা অপেক্ষা তাহাতে অধিক রস আছে, তাহা এই;—

শ্রীযুক্ত বি, বি, সাহা এণ্ড কোং

মালদহ।

মহাশয়,

আমার পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণকিশোর সান্যাল আপনার কুন্তল তৈলের বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভ্যালুপেএবল ডাকে ঐ তৈল এক শিশি আনাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আমার নিকট এ কথা প্রকাশ করে নাই; শুনিয়াছি ঐ তৈল মালিশ করিলে কেশহীন স্থানে কেশোদ্গত হয়, এই কথা বিজ্ঞাপনে পাঠ করিয়াই সে এ কাজ করিয়াছে; বাবাজীর মাথায় কেশ প্রচুর আছে, কিন্তু তাহার অষ্টাদশ বৎসর বয়স হইল, এ পর্য্যন্ত দাড়ি গোঁফের কোন চিহ্নমাত্র প্রকাশ না হওয়ায় বাবাজী কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ী দাড়ী গোঁফ লাভের আশায় মুখ মণ্ডলে মালিশ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ তৈল আনাইয়াছে, এবং মুখে এক দিন মাত্র মালিশ করিয়াছে, ঐ এক দিনের মালিশেই তাহার মুখে চিরস্থায়ী কালো বার্ণিসের পত্তন হইয়াছে, পিয়ার্সের সাবান দুরের কথা, নারিকেলের ছোবড়া ঘসিয়াও সে বার্ণিস চটাইতে পারিলাম না; বাবাজীবন লোক সমাজে মুখ দেখাইতে অক্ষম হইয়া বাড়ীর ভিতরেই সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, এবং কয়েক দিন হইতে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। তৈলের খোসবোটিও অতি চমৎকার, বোধ করি ইহার মধ্যে কয়েক

ফৌটা করিয়া ছারপোকা, তেলাপোকা, এবং ঝেলোপোকার আরক আছে, যাহা হউক কয়েক দিন ধরিয়া মুখের উপর এসেন্স 'দেলখোস' লাগাইয়া গন্ধটাকে নষ্ট করা গিয়াছে, কিন্তু রঙটি কিসে অন্তর্হিত হয় তাহা লিখিলে পরমোপকৃত হইব। দাম আর ফেরত চাই না। আপনার এ ব্যবসায় কত দিনের? সাবধান হইয়া ব্যবসায় চালাইবেন, নতুবা পেটের দায়ে পিঠে বিস্তর খাইতে হইবে। ইতি—

শ্রী নবকিশোর সান্যাল।

আমি পত্র তুখানি নকল করিয়া লইয়া হেড্ ক্লার্ককে ফেরত দিয়া বলিলাম, "মহাশয় বঙ্ক সাহার আসল বাড়ী কোথায় জানেন কি?"

হেড্‌ক্লার্ক বলিলেন, "শিবগঞ্জ, এখান হইতে এগারো বারো ক্রোশ হইবে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমৃদ্ধ গ্রাম, ইচ্ছা করেন ত ষ্টীমারে যাইতে পারেন, আই, জি, এস্, এন্, কোম্পানীর 'তিলোত্তমা' ষ্টীমার আজ বেলা চারিটার সময় সিরাজগঞ্জ ছাড়িবে।"

আমি প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাহার পরে পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই দিনই ষ্টীমারযোগে সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিলাম। সিরাজগঞ্জে বঙ্ক সাহার বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, সেখানে তাহার নিজের ঘরবাড়ী কিছুই নাই, লোকটা মামার বাড়ী থাকিত, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে একেবারে নিরুদ্দেশ।

শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়
বরোদা, গায়কাড় রাজ্য।



তৃতীয় পুরস্কার ১৫৲

অবগুণ্ঠিতা।

(১)

মাতা অনেক চেষ্টা করিয়াও মেয়ের চরিত্র সংশোধন করিতে পারিলেন না।

দুই বৎসরের কন্যা শৈলবালাকে লইয়া জননী বামাসুন্দরী বিধবা হন। স্বামী রামজীবনের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিলনা; নগদ অর্থ ও যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। সরিকী মোকদ্দমায় জমিটুকু রক্ষা করিতেই বামাসুন্দরীর নগদ অর্থগুলি নিঃশেষিত হইয়া যায়। সে আজ দশ বৎসরের কথা; এক্ষণে এই যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ও কন্যা শৈলবালাই বিধবার একমাত্র সম্বল; তিনি ভাবিয়াছিলেন, কন্যাটীকে গুণবতী করিয়া যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিতে পারিলেই তাঁহার সাধ ও কর্ত্তব্য পূর্ণ হয়। কিন্তু মায়ের শত চেষ্টাতেও মেয়ে মায়ের মনের মত হইল না!

শৈলর গুণের চেয়ে রূপের ভাগই বেশী ছিল। নিভৃত কাননের এক প্রান্তে বন-মল্লিকার শুভ্র কুট্মল যেমন আরণ্য প্রকৃতিকে খণ্ড সুষমায় অলঙ্কৃত করে, তাহারও অপূর্ব্ব রূপ রাশি বিধবার জীর্ণ কুটীর শত শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছিলন। শৈলর ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু তাহার এই অপরূপ রূপগর্ব্বে সর্ব্বদা স্ফীত হইয়া থাকিত। সে পৃথিবীতে আর কাহাকেও আপনপেক্ষা সুন্দরী মনে করিতনা, এবং গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয়ের সতীর্থা বালিকা বৃন্দের সহিত প্রতি কথায় তাহার নাসিকাদেশ ও ভ্রূযুগল কুঞ্চন পূর্ব্বক যথাসাধ্য পরস্পর সন্নিহিত হইয়া এই ভাবই প্রকাশ করিত। শৈলর সঙ্গে কথায় কাহারও আঁটিয়া

উঠিবার সাধ্য ছিলনা। মা যাহা বলিতেন শৈল তাহার বিপরীত করিয়া বসিত! বামাসুন্দরী একাকিনী গৃহকার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না। শৈল কোন দিন ভুলিয়াও তাঁহার সাহায্য করিত না। শৈলবালা আপনার ইচ্ছামত বিদ্যালয়ে "গুরুমার" নিকট "উপস্থিত" হইয়া বাকী সময় টুকু রায়েদের বকুল বাগানে, মুখুয্যেদের বাঁধা ঘাটে এবং ভুলু চাষীর ছোলার ক্ষেতে পুরুষোচিত ক্ষমতা ও গুণ বিস্তার করিয়া কাটাইয়া দিত। মাতা যদি কোন দিন শাসন করিতে গিয়া বলিতেন "শৈল, ষেটের বাছা তুই সোমত্ত মেয়ে হ'তে চল্লি, এখনও কি তোর বুদ্ধি সুদ্ধি হ'ল না? অমন করে পথে ঘাটে বেড়ান আর ভাল দেখায় না। এত বড় মেয়ে হ'লি, খড়গাছি ভেঙ্গে দু'খান কত্তে শিখ্‌লি না, আজ বাদে কাল পরের ঘর করবি, শাশুড়ী ননদে লাথি ঝাঁটা খেতে খেতে তোর জিউ যাবে, লক্ষ্মী মা, বদ্‌তরিবংগুলো ছাড়",—তাহা হইলে সেদিন মেয়েকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিতে এবং ভাত খাওয়াইবার জন্য সাধিতে সাধিতে মাতাকে অনেকখানি বেগ পাইতে হইত।

(২)

পাত্র পাত্রীর রূপ গুণ থাক্ বা না থাক্,—বঙ্গদেশের অত্যুর্ব্বর মৃত্তিকার গুণে তাহাদের বিবাহলতা সামাজিক "শুভঙ্করের" আর্য্যানুসারে যথা সময়ে পুষ্পবতী হইতে ভুলেনা! শৈলবালা "বিবাহ" অপেক্ষা বসু মহাশয়ের "নূতন পাঠ" এবং রায় মহাশয়ের "বকুল গাছটীকেই" বেশী বুঝিত। কিন্তু "পাড়া পড়্‌সীর" চোখে যে ঘুম ছিল না, সেজন্য একঘরে হইবার ভয়ে বামাসুন্দরী শৈলর পাত্রান্বেষণে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না।

কে মনে করিয়াছিল, অসহায়া দরিদ্রা বিধবার এমন অপদার্থ কন্যাটীকে গ্রাম্য-জমিদার-পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন? আজ কাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, পিতামাতা যখন উপাধিধারী পুত্রের বিবাহের জন্য পণ ও যৌতুকের লম্বা লম্বা ফৰ্দ্দ প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকেন, তখন পুত্রটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল

556

পুস্তক-স্তূপ হইতে আপনার শান্ত নয়ন যুগল উৎসারিত করিয়া একটু সৌন্দর্য্যের জন্য ইতস্ততঃ প্রধাবিত করেন এবং ভাবী পত্নীর সহিত "সূর্য্যমুখী", "কমলমণি" অথবা "ভ্রমরের" সাদৃশ্য পাইতেই অধিকতর ব্যগ্র হন! শৈলবালার সেই আধ-প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মাধুরী কোন্ শুভক্ষণে সত্যেন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কুসুমেষু মকরকেতনই কেবলমাত্র তাহা অবগত আছেন!

জমিদার পুত্র জামাতা হইবেন, বামাসুন্দরী স্বপ্নেও ভাবেন নাই! পাত্রপক্ষ প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি সাদরে স্বীকৃতা হইলেন। সত্যেন্দ্র নাথের ন্যায় বিদ্বান্, ধনবান, সুরূপ, সচ্চরিত্র পাত্রে কন্যাদান করিয়া তাঁহার আবৈধব্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। যে রূপরাশি বন্য বকুলের অযত্নগ্রথিত মালিকাতেই শতগুণে বর্দ্ধিত হইত, তাহা আজ পুষ্পরাগখচিত সুবর্ণহারে সংযুক্ত হইয়া স্বামিগৃহ প্রদ্যোতিত করিল!

(৬)

গ্রামের অর্দ্ধেক খানি জায়গা জুড়িয়া জমিদার অন্নদাগোবিন্দের বৃহৎ ভবন। রাজধানীর ধনি-প্রাসাদের ন্যায় ইহা শ্বেত মর্ম্মর-স্ফটিক খচিতা, সুরুচিসম্পন্ন (?) চিত্রাবলী পরিশোভিতা মনোহারিণী অট্টালিকা না হইলেও ইহাতে গ্রাম্য সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না! পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান। "ড্রেনের গন্ধ ম্যালেরিয়া" ইহার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিতে পারিত না। সুস্বচ্ছ সরোবর সমূহ, তাহার চতুষ্পার্শ খর্জ্জুর তাল নারিকেল বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন; প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের পর সুদৃশ্য উপবন বিচিত্র বর্ণ কুসুমে পরিশোভিত। মধ্যে মধ্যে আম্র, কাঁটাল, কদলী প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিটপি-শ্রেণী। কোথায়ও সুশীতল বাপী-সলিলে রাজহংস ক্রীড়া করিতেছে, কোথায়ও বা সুমন্দ মলয়ানিল-সঞ্চালিত রক্ত পদ্ম-থর!—এই কবিজনারাধ্যা প্রকৃতি সুষমার তুলনা কোথায়?

নিদাঘ অপরাহ্ন শেষ প্রায়। অন্তপুর দীঘিকার কালো জল ঘন বিন্যস্ত আম্র বৃক্ষের ছায়া-পাতে আরও কালো হইয়াছে। ইতস্ততঃ কমলিনী কোরক ফুটিয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে শৈলবালা নিস্তব্ধ

সোপানাবলী অলঙ্কার ঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া জলে নামিল। তাহার নিমজ্জমান্ দেহ মৃণালে পূর্ণপরিস্ফুট আনন-পদ্ম প্রাকৃতিক সরোজ-শোভাকে ম্লান করিয়া দিল! সন্ধ্যায় প্রস্ফুট কমল দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না;—কেবল অদূরস্থিত সহকার শাখান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া একটী ভাগ্যবান্ সুপুরুষ এই অনৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন—তিনি সত্যেন্দ্র নাথ!

হঠাৎ শৈলর দৃষ্টি সেদিকে পড়িল। সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া শৈল তাড়াতাড়ি আর্দ্র বস্ত্র মাথায় টানিয়া দিল, তাহার এত সাধের বৈকালিক খোপাটী জলে ভিজিয়া গেল। সত্যেন্দ্র আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া বলিলেন "ছি শৈল, অবেলায় ভিজা কাপড় মাথায় দিও না, অসুখ করবে। শীগ্‌গীর ফেলে দেও।"

শৈল। তুমি দুষ্টুমী করিয়া আমায় লুকিয়ে দেখ্‌ছিলে কেন?

সত্যেন্দ্র। তা না হ'লে তোমাকে দেখ্‌তে পাই কই? তোমার খালি তিন হাত ঘোমটা দেখে আমার লাভ?

শৈল। তবে এখন বিবি সাজ্‌তে হবে নাকি?

সত্যেন্দ্র। আচ্ছা আর কোন দিন লুকিয়ে দেখ্‌ব না; এখন ভিজে কাপড় ফেল।

ঘোমটা ফেলার কারণ যে শুধু লজ্জা, তাহা নহে; শৈলর সেই বাল্য একঁ গোঁয়ামী এখনও দূর হয় নাই। সে ঘোমটা ফেলা দূরে থাক, আরও খানিক লম্বা করিয়া টানিয়া বেশী জলে সরিয়া দাঁড়াইল।

সত্যেন্দ্র তখন আসল কথা পাড়িয়া বলিলেন "শৈল, তোমায় শুধু লুকিয়ে দেখ্‌বার জন্য আসিনি, কালই আমি কলিকাতায় যাচ্ছি; ভট্টাচার্য্য মশায়ের কাছে গিয়াছিলাম, তিনি সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিয়া থাকিতে বলিলেন। একটু পরেই চলে যাব—, তাই একবার তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলাম; তাতে এমন যদি অপরাধ হয়ে থাকে বল চলে যাচ্ছি।"

শৈলবালা এ সব কথায় নরম হইবার মেয়ে নয়, সে বলিল,

"তা কলিকাতায় যাবে যাওনা; আমি ঘোম্‌টা না খুলিলে কি কল্‌কাতার রাস্তা খোলসা হচ্ছে না ?"

সত্যেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। সহসা বুদ্ধি করিয়া বলিলেন "তা নয় গেলাম, কিন্তু পূজার ছুটীতে আস্‌বার সময় তোমার কি কি জিনিষ আন্‌তে হবে তা' না জান্‌লে কেমন করে যাই ?"

এবার ঠিক জায়গায় ঔষধ পড়িয়াছিল। শৈল নরম হইয়া বলিল "তুমি কি কি আন্‌বে আগে বল, তবে কাপড় ফেল্‌বো।"

সত্যেন্দ্র। তুমি যা চাইবে, তাই দিব। লক্ষ টাকার জিনিষ !

কথাটা হটাৎ বলিয়া ফেলিয়া সত্যেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু শৈলর কাছে কাজের কথা ফাঁক যাইবার সম্ভাবনা নাই; সে কথাটী ধরিয়া বলিল "আমিও তাই চাই—লক্ষ টাকার জিনিষ, তার কম হ'লে আর কোন দিন ঘোমটা খুল্‌বো না। এই নাও—" বলিয়া শৈল মাথার কাপড় ফেলিয়া দিল !

সলিলসিক্ত হওয়ায় শৈলের রূপ আরও বাড়িয়াছিল; কুন্তলীকৃত বেণী বহিয়া বারিবিন্দু কপোল ছড়াইয়া পড়িতেছিল, সত্যেন্দ্রনাথ সতৃষ্ণনয়নে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে করিতে "তবে আসি, শৈল,,—বলিয়া বিদায় গ্রহন করিলেন।

(৪)

পূজা আসিয়াছে। মেঘশূন্য নীল নির্ম্মল গগনে সুধাকর হাসিতেছে। দিক্‌বসনা প্রকৃতি পূর্ণাঙ্গী; প্রতি পুষ্পেপুত্রে, প্রতি নদীকলতানে, প্রতি কোকিল কাকলীতে, প্রতি গিরি-নির্ঝরে তাহার অতুল সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে !

গ্রাম,পথ বহিয়া একখানি গোশকট চলিয়াছে। গাড়োয়ান একবার গরুর লেজগাছি মলিয়া দিয়া "মর, মর এদিকে" বলিতেছে; কখনও হস্তস্থিত চর্ম্মরজ্জুখানির সহিত গো-বেচারীর পৃষ্ঠস্থিত চর্ম্মের বল পরীক্ষা করিতেছে! ভিতরে একটী যুবক আরোহী। তাঁহার মলিনতাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝা যায় কোন বিষাদপূর্ণ চিন্তা তাঁহাকে এই শারদীয় প্রকৃতির সুখ-উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া

রাখিয়াছে। যুবক আপনার পকেট হইতে একখানি পঠিত পত্র বাহির করিয়া পুনরায় পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"প্রিয়তম!

তোমার পত্রে জানিলাম, তুমি শীঘ্রই বাড়ী আসিতেছ। সেইদিন পুকুরের ধারে ঘোমটা ফেলার প্রতিজ্ঞাটী মনে আছে ত? সেইটী স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্যই এই পত্র লিখিলাম! লক্ষ টাকার জিনিষ ভুলোনা যেন, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আড়ি। ইতি

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী

শৈল।

পত্র পড়িয়া সত্যেন্দ্রনাথ আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন! কি কুক্ষণে তিনি একটী বেফাস কথা বলিয়া ফেলিয়া ছিলেন, সেই দিন হইতে "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"—এই নীতি বাক্যের তাৎপর্য্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন! এবার কলিকাতা গিয়া পড়াশুনাতেও বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। পূজায় বাড়ী আসিবার সময় কলিকাতা বাজারের অৰ্দ্ধেক দ্রব্য তিনি পোর্টমেণ্টসাৎ করিয়াছেন, তথাপি প্রতিশ্রুতির পক্ষে যথেষ্ঠ হইল না মনে করিয়া চিন্তিত হইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী জমিদার মহাশয়ের সিংহদ্বারে আসিয়া লাগিল। জিনিষ পত্র তোলার ধূম, ডাক্ হাঁক্, হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পিতা মাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ-সম্ভাষণ, অনুচরভৃত্যের আদর আপ্যায়িতের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই।

(৫)

এক হাত ঘোমটা টানিয়া শৈলবালা সত্যেন্দ্রের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিল। সত্যেন্দ্র একখানি শোফায় ঠেস্ দিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। শৈলকে দেখিয়া বলিলেন "শৈল ভাল আছত?"

শৈল। বিধাতা যেমন রেখেছেন। শৈল কিন্তু ওসব বাজে কথায় ভুল্‌ছে না, আমার জিনিষ কোথায়?

সত্যেন্দ্র। ঘোমটা না খুল্‌লে দিব না।

শৈল। না দিলে ঘোমটাও খুল্‌বো না।

সত্যেন্দ্র একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া পোর্টমেণ্টের ভিতর হইতে একে একে আয়না, চিরুনী সাড়ী, বডি প্রভৃতি শৈলের পদপ্রান্তে রাখিতে রাখিতে বলিলেন "দেখ দেখি শৈল, এবার আরবারের চেয়ে কত বেশী জিনিষ এনেছি ;—এখন "দেহি পদ পল্লবমুদারম্‌"!

শৈল। তা "মানভঞ্জনের" পালাই গাও আর "হনুমানের বস্ত্রহরনের" পালাই গাও, আমার জিনিষ চাই ই। এই বুঝি তোমার লক্ষ টাকার জিনিষ! আয়না, চিরুনী আর বুঝি কেহ কোন দিন চক্ষে দেখে নাই। অত টাকার কথা দূরে থাক্‌—একটা নূতন জিনিষই বা কই ?

সত্যেন্দ্র যেন অকূল সাগরে তীর পাইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে চিন্তার কৃষ্ণ ছায়া অপসারিত হইল—বলিলেন "আচ্ছা, তার জন্য কি ? এবার তোমার জন্য নূতন জিনিষও এনেছি, এখন খুসী হবে তো ?" তারপর আর একটী বাক্স হইতে দুই শিশি "কুন্তলীন". ও এক শিশি "দেলখোস্‌" বাহির করিয়া শৈলর হাতে দিয়া বলিলেন "দেখ কেমন নূতন জিনিষ ; আয়না, চিরুনীই যেন চক্ষে দেখিয়াছ, এমন সুন্দর সুগন্ধি তেল তো আর চোখে দেখা কপালে ঘটে নাই। এখন ঘোমটা খুলিয়া একটু মাথায় দাও দেখি, তা হ'লে তোমার গরম মেজাজটা সুদ্ধ নরম হবে।"

শৈল শিশিগুলি হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাগে তাম্বূলরস-রাগরঞ্জিত অধর দুইটী ফুলাইয়া বলিল—"ছাই তেল, ছেলে ভুলাতে এসেছেন। আমি এ চাই না"—বলিয়া ঘরের মেজেয় শিশি তিনটী সজোরে নিক্ষেপ করিল। শিশি চূর্ণ হইয়া তৈলগুলি সুমসৃণ মেজে বহিয়া ঢেউ খেলিতে লাগিল!

আজ এই প্রথম সত্যেন্দ্র শৈলর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া শোফায় আসিয়া বসিলেন। শৈলও ক্রোধভরে নিজ পালঙ্কে গিয়া শয়ন করিল।

এতক্ষণ পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছিল; তাহার মূর্চ্ছাতুর মৃদুকররাশি উন্মুক্ত দ্বার ও বাতায়ন দিয়া তৈল-নিষিক্ত মেজেয় পড়িয়া অস্পষ্ট চন্দ্রমণ্ডল সৃজন করিতেছিল! সত্যেন্দ্র বসিয়া

বসিয়া এই শোভন শোভা দেখিতেছিলেন। শৈল ইতঃমধ্যে রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তখনও সে দুই হাতে ঘোমটা ধরিয়া আছে, পাছে কেহ "চুরি করে চায়"! এ রহস্য দেখিয়া সত্যেন্দ্রের মনে পড়িতেছিল ঃ—

"আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান,
কেবল সরমখানি রেখেছি!
চাহিয়া নিজের পানে
নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।"

—ভাবিতে ভাবিতে সত্যেন্দ্রের চক্ষু দুটী মুদিয়া আসিল, তিনি শোফাতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন!

(৬)

গভীর রজনী। হঠাৎ একটী গুরুতর পতন শব্দে সত্যেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ততক্ষণ চন্দ্রদেব অস্ত গিয়াছেন, প্রদীপও নিবিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র অনুভব করিলেন, ঘরের মধ্যে কি যেন নড়াচড়া করিতেছে। তিনি ভয়চকিতচিত্তে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলেন একটী অপরিচিত লোক ঘরের মেজেয় পড়িয়া আছে! শিশির চূর্ণিত এক খণ্ড কাচ তাহার দক্ষিণ পাঁজরায় দারুণ বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে আরও দুই চারি খানি কাচ ফুটিয়াছে। রক্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মাখিয়া গিয়াছে। উঠিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নাই! তাহার নিকটে একটী বৃহৎ বোচ্‌কা পড়িয়াছিল।

সত্যেন্দ্রের চীৎকারে বাড়ীর ভৃত্যেরা দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল! লোকটী কেবল কাঁদিতে লাগিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের পর জানা গেল,—সে একটী পাকা চোর। গভীর নিশীথে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকায় সুবিধা পাইয়া কোন ক্রমে প্রবেশ লাভ করে। তাহার সঙ্গে সুষুপ্তিকর ঔষধ ছিল, তাহার আঘ্রাণ দ্বারা শৈলকে গভীর নিদ্রিত করিয়া তাহার গাত্রস্থিত যাবদীয়

বহুমূল্য অলঙ্কার এবং গৃহজাত অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি যাহা পাইয়াছিল চুরি করিতেছিল। ঘরের খানিক মেজে যে তৈল পিচ্ছিল ছিল, সে তাহা জানিত না! হঠাৎ পা দেওয়ায় পড়িয়া গিয়া এ দুর্দ্দশা। তাহার নিকট সেই বোচ্‌কাটীতে শৈলর সমস্ত অলঙ্কার ও অপহৃত দ্রব্যাদি পাওয়া গেল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুলিশে দেওয়া হইল!

পরদিন সত্যেন্দ্র শৈলকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন "কি শৈল, লক্ষ টাকার জিনিষটা বুঝ্‌লে ত কেমন? এখন খুসী হয়েছ!"

ইতঃপূর্ব্বেই শৈল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল "হাঁ, ভাগ্যিস্ তেলটা এনেছিলে, তাই আমার লাখ্ টাকার গহনা পত্রগুলো পেলাম্। এসব দেবতার কাণ্ড!"

সত্যেন্দ্র। খবরদার, আর কোন দিন ঘোমটা দিওনা যেন!

শৈল। খবরদার, আজই আমার জন্য এক ডজন ঐ তেল আন্‌তে পাঠান হয় যেন!

বলা বাহুল্য উভয়েই উভয়ের এই সাবধান-বাক্য পালন করিয়াছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা
ঘোড়ামারা, রাজসাহী।



চতুর্থ পুরস্কার ১০১

দুর্ভাগা।

(১)

আমার পিতার নাম তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভাগলপুরে জজকোর্টের উকিল। ওকালতীতে তাঁহার বেশ পশার ছিল। আমি পিতা মাতার একমাত্র আদরিণী কন্যা। আমার আর ভাই বোন ছিল না। আমাদের বাড়ীর পাশে আর কোন প্রতিবেশী না থাকায়, আমার আর খেলার সাথী কেহ ছিল না। আমি নিয়মমত লেখা পড়া করিতাম। মায়ের নিকট শেলাই শিখিতাম। বৈকালে পিতার উদ্যানে বেড়াইতে যাইতাম। আমাদের একটি হরিণ শিশু ছিল। আমি উদ্যানে গিয়া তাহার সহিত খেলা করিতাম। এইরূপে জীবনের নয় বৎসর অতীত হইল।

(২)

আজ কয়েক দিন হইল আমার পিতা কোন কার্য্য বশতঃ কলিকাতায় গিয়াছেন। আজ তাঁর আসিবার কথা। কলিকাতা যাইবার সময় বাবা আমার জন্য অনেক জিনিষ আনিবেন বলিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি আনন্দে তাঁহার আসিবার সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। যথা সময়ে আমার পিতা বাড়ী আসিলেন এবং তাঁহার সহিত একটী বালকও আসিল। ছেলেটি দেখিতে ফুট্‌ফুটে সুন্দর বয়স আন্দাজ চতুর্দ্দশ বৎসর। বাবা মায়ের নিকট ছেলেটীর পরিচয় দিলেন। নাম নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম রমানাথ মুখোপাধ্যায়, সওদাগরি আফিসে ৬০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। নরেন্দ্রনাথ অতি শৈশবে মাতৃহীন। রমানাথ বাবু দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন

নাই। আমার পিতার সহিত রমানাথ বাবুর অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তাঁহারা উভয়ে একত্রে লেখা পড়া করিয়াছিলেন। পিতা কলিকাতা গিয়া পরদিনই রমানাথ বাবুর সহিত দেখা করিতে যান, গিয়া দেখিলেন তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। একমাত্র পুত্রকে অকূল দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিন সহস্র টাকা ও নরেন্দ্রনাথকে আমার পিতার হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাই তারানাথ! আমি আমার পুত্রকে এবং এই টাকা তোমার হাতে দিয়া চলিলাম, তুমি উহাকে দেখিও।"

আহা নরেন বড় দুর্ভাগা।

(৩)

নরেন্দ্রনাথ আমাদের বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। আমার জনক জননী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ মমতা করিতেন। নরেন্দ্রনাথকে কয়েক দিন আমার পর পর ঠেকিল। তিনিও আমার সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন। কিছুদিন এইরূপে কাটিল।

এখন নরেন্দ্রনাথের সহিত আমার খুব ভাব। তাঁহাকে আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসি এবং দাদা বলিয়া ডাকি। তিনি আমার নাম করিয়া অর্থাৎ বিনাপাণি বলিয়া ডাকেন। আমরা একত্রে লেখা পড়া করি। একত্রে আহার ও একত্রে ভ্রমণ করি।

এইরূপে আমার জীবনের আরও পাঁচ বৎসর অতীত হইল। আমার বয়স এখন চতুর্দ্দশ বৎসর। আমি আজও অবিবাহিতা। জানি না কেনআজও আমার বিবাহ হয় নাই। আমার পিতার অর্থের অভাব ছিল না, আর আমি কুৎসিতাও নই। আমাকে সকলেই সুন্দরী বলিত। তবে কেন যে আমার বিবাহে এত বিলম্ব হইতে লাগিল তাহা বলিতে পারি না। এত বড় মেয়ে অবিবাহিতা বলিয়া যে আমার পিতা মাতার ভাবনা আছে সেরূপ বোধ হইত না। আমারও বিবাহের কথা বড় একটা মনে হইত না।

(৪)

এইরূপে পিতা মাতার স্নেহে ও আদরে আমার দিন যাইতে লাগিল। এখন আমি একলাই থাকি। নরেন্দ্রনাথের সহিত আমার বড় একটা সাক্ষাৎ হয় না। নরেন্দ্রনাথ এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। আর আমিও নিতান্ত বালিকা নই। এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নয়, তাহা আমি বুঝিতাম। তবে নরেন্দ্র যখন অন্দরে আসিতেন তখন দাদা বলিয়া তাঁহার নিকট যাইতাম। তাঁহার কাছে পড়া বলিয়া লইতাম। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আমার সহিত কথা কহিতে যেন সঙ্কুচিত হইতেন। পড়া বলিয়া দিতে গেলে প্রায়ই গোলমাল হইয়া যাইত, প্রায়ই ভুল করিতেন। আমি যখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পড়া বলিতাম তখন তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন। আমি পড়া মুখস্থ করিতে করিতে চাহিয়া দেখিতাম তিনি সস্নেহ দৃষ্টিতে আমায় দেখিতেছেন। আমি দেখিতে পাইলাম, দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতেন।

(৫)

একদিন বৈকালে আমি খিড়কীর বাগান হইতে বাড়ী আসিয়া জননীকে দেখিতে পাইলাম না। উপর নীচে সকল গৃহ অনুসন্ধান করিয়া কোন খানে তাঁহাকে না দেখিয়া ছাতে উঠিলাম। "নরেনের সহিতই বীণার বিয়ে দাও" হঠাৎ জননীর এই কথা আমি শুনিতে পাইলাম। আমারই বিবাহের কথা হইতেছে শুনিয়া আর অগ্রসর হইলাম না, সেইখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। অনুমানে বুঝিলাম পিতাও তথায় আছেন। শুনিলাম পিতা বলিলেন—"বীনাপাণির সহিত নরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইতে পারে না। আমার একমাত্র কন্যা ধনীর গৃহে বিবাহ দিব, শ্বশুর শ্বাশুড়ী থাকিবে, সাধ আহ্লাদ করিবে। নরেন্দ্র ছেলে ভাল হইলেও উহার তিন কুলে কেহ নাই। নরেনের সহিত বীণার বিবাহ দিতে তুমি আর আমায় বলিও না।"

মা বলিলেন—"তোমার যখন মত নাই তখন আমি আর কি বলিব। কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত বিবাহ হইলে ভালই হইত। উহারা

মন্দ ঘর নয়। আমার বড় ইচ্ছা উহার সহিত বীণার বিয়ে দি। নরেন দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শান্ত। দুইটা পাশও দিয়াছে। আর তাহা হইলে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতে হইবে না। আমাদের ঐ এক-মাত্র মেয়ে, উহাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া কি লইয়া সংসারে থাকিব” —বলিতে বলিতে মার কথা জড়াইয়া আসিল। অনুমানে বুঝিলাম মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বাবা বলিলেন—“মেয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া কি হইবে! কন্যা চিরদিন শ্বশুরালয়ে থাকে ইহাই ত পিতা মাতার প্রার্থনা। চিরকাল পিত্রালয়ে থাকে ইহা প্রার্থনায় নহে। তুমি বলি-তেছ নরেন্দ্র ভাল ছেলে। নরেন্দ্র যে সচ্চরিত্র ও বিদ্বান অবশ্য তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। আমি উহা অপেক্ষা ভাল ছেলে দেখিয়া বীণার বিয়ে দিব। নরেন্দ্রনাথকে আমি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি। উহার যাহাতে ভাল হয় তাহাও আমি করিব। আমি ইচ্ছা করিয়াছি বীণার বিবাহের পরেই একটী সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিব। আর আজই কিছু আমি বীণার বিয়ে দিতেছি না। চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ না হইলে বীণার বিবাহ হইতে পারে না। ভাল কথা, সেদিন কলিকাতা হইতে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বীণার অদৃষ্ট গণনা করিতে বলিলাম। তাহাতে তিনিও গণনা করিয়া ঐ কথা বলিলেন'। চতুর্দ্দশ বর্ষে বিবাহ হইলে বীণা নিশ্চয় বিধবা হইবে।” ইহা বলিয়া পিতা গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন।

বাবার জুতার শব্দে বুঝিলাম তিনি শীঘ্রই নীচে আসিবেন সুতরাং ধরা পড়িবার ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি পলায়ন করিলাম।

(৬)

জনক জননীর কথা শুনিয়া বুঝিলাম কেন আমার বিবাহ হইতে বিলম্ব হইতেছে। নরেন্দ্রের সহিত আমার বিবাহ হইবে একথা আমি কখন মনে করি নাই, নরেন্দ্রনাথকে ভাল বাসিতাম

বটে, কিন্তু সে ভালবাসা অন্য প্রকার। আমি নরেন্দ্রকে ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিতাম। কিন্তু জননীর মুখে একথা শুনিয়া দুই একবার মনে হইয়াছিল; নরেন্দ্রনাথের সহিত আমার বিবাহ হইলে কি ভাল হয়?

'নরেন্দ্রনাথ রূপবান বিদ্বান ও সচ্চরিত্র; এরূপ স্থলে বিবাহ হইলে ভাল হয় বই কি'।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হওয়াটা আমার যেন কেমন কেমনঠেকিল। যাহাকে চিরকাল দাদা বলিয়া ডাকিয়াছি, দাদার মতনই দেখিয়াছি, তাঁহার সহিত বিবাহ—ছিঃ!

(৭)

আমি চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার বিবাহের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম যিনি আমার স্বামী হইবেন তিনি এম,এ পাশ। আমার ভাবী শ্বশুর একজন বড়লোক। বাড়ী কলিকাতায়। বিবাহের কথা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল।

আমার বিবাহের আর বিলম্ব নাই। পনর দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। বিবাহের জিনিষপত্র আনিবার জন্য আমার পিতা কলিকাতায় গিয়াছেন। দুই তিন দিন পরে তিনি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন। অন্যান্য স্থানহইতে আমাদের আত্মীয়, কুটুম্ব সকল আসিয়াছেন। আমি পিতা মাতার এক মাত্র সন্তান। কাজেই আমার বিবাহে মহা সমারোহ।

(৮)

কাল বিবাহ। মা ট্রাঙ্ক পেটারা হাতবাক্স প্রভৃতি সাজাইতেছিলেন। আমার পিতাও তথায় ছিলেন। আমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম! দেখিলাম মা দুইটী সুন্দর শিশি আমার বাক্সে রাখিলেন। আমি এসেন্সের অনেক সুন্দর শিশি দেখিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর শিশি দেখি নাই। আমি ব্যগ্র হইয়া মাকে উহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার কথা শুনিয়া পিতা বলিলেন, ইহার একটী **কুন্তলীন—অপরটী এসেন্স দেলখোস্; ইহা নূতন উঠিয়াছে। কলিকাতার এইচ্, বসু ইহার প্রস্তুতকারক। ইহার সুগন্ধ অতি মনোহর।** তাই

তোমার জন্য আনিয়াছি এই কথা বলিয়া পিতা কুন্তলীন ও দেলখোসের ছিপি খুলিয়া আমায় আঘ্রাণ লইতে বলিলেন। আহা কি মনোহর গন্ধ! সুগন্ধে সে স্থান আমোদিত হইল।

আমার আর আহ্লাদের সীমা নাই। যথা সময়ে বর মহা সমারোহ করিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন। গোধূলি লগ্নে বিবাহ। খুব সমারোহের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াগেল। শুভ দৃষ্টির সময় বর দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

বিবাহে নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নানা কায করিয়াছিলেন। তাঁহার যেন খুব অহ্লাদ হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি আমার পিঁড়ে ধরিয়া সাত পাক ঘুরাইতে ছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর দিকে চাহিয়া দেখি মুখ বড় বিবর্ণ। কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে! দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম!

সকলে বর কন্যা লইয়া বাসরে যাইতেছে, এমন সময় শুনিলাম নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া গিয়াছেন। শুনিবা মাত্র আমরা তথায় গেলাম। গিয়া দেখি আমার পিতা মাতা তথায় আছেন। নরেন্দ্র অচৈতন্য অবস্থায় বাবার কোলের উপর শুইয়া আছেন। মা বাতাস দিতেছেন। অনেক শুশ্রূষার পর তাঁর চৈতন্য হইল। তিনি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "বড় পরিশ্রম করিয়াছিলাম, গরমের জন্য বোধ হয় এইরূপ হইল। এখন একটু নিদ্রা গেলেই সব ভাল হইয়া যাইবে।" তদনুসারে আমার পিতা একজন ভৃত্য সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে শয়নগৃহে যাইতে বলিলেন নরেন্দ্রনাথ অতৃপ্ত নয়নে একবার আমার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও বাসরে গেলাম।

পর দিন প্রাতেঃ নরেন্দ্রনাথকে কেহ দেখিতে পাইল না। সকলে মনে করিল কোথায় গিয়াছে এখনই আসিবে। ক্রমে বেলা হইল, তবু নরেন্দ্রের দেখা নাই। পিতা ভাবিত হইয়া নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন কিন্তু সকলেই বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। নরেন্দ্র আসিলেন না, কেহই তাঁর দেখা পাইল না। মা কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা নিজে অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। নরেন্দ্রের

জন্য আমারও বড় কষ্ট হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে নরেন্দ্রের শয়ন ঘরে গেলাম। শূন্য গৃহ, নরেন্দ্র নাই। শয্যায় বসিয়া হঠাৎ বালিস তুলিয়া দেখি একখানি পত্র আমারই নামে লেখা। ব্যস্তভাবে পত্র খুলিয়া পড়িলাম—

বীণাপাণি !

আমি শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইয়াছিলাম। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে আমি বড় সুখে ছিলাম। আমি মনে মনে একটী দুরাশা পোষণ করিতে ছিলাম। আমি দুর্ভাগা, আমার সে আশালতা ছিন্ন হইয়াছে। গৃহবাসে আমার সুখ নাই, তাই গৃহত্যাগ করিলাম। আমার অনুরোধ তোমরা আমার অনুসন্ধান করিও না। আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরসুখিনী হইয়া অক্ষয় সুখে কালযাপন কর।

পত্র পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমিও মনে করিলাম—

আহা, নরেন বড় দুর্ভাগা।

শ্রীমতী সরমা দেবী

মজঃফরপুর।



পঞ্চম পুরস্কার

রঙ্গিয়া।

(১)

গ্রামের একটী নিভৃত প্রান্তে ক্ষুদ্র বাগানবাটী আমাদের বাসস্থান। আমাদের একখানি ক্ষুদ্র একতালা বাড়ী; তাহার সম্মুখে একটী পুষ্করিণী এবং সেই পুষ্করিণীর চারিদিকে সুপারি, নারিকেল এবং আম গাছের ঘন শ্রেণী। বাগানের একটী ধার পরিষ্কার করিয়া সেখানে দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ লাগাইয়াছিলাম এবং মধ্যস্থলে একটী লতাগৃহই আমার চিন্তামন্দির। অন্ন সংস্থানের চেষ্টায় ঘুরিবার আবশ্যক ছিল না; পিতার কোম্পানীর কাগজের সুদেই চলিয়া যাইত। আমি আমার জীবনের অখণ্ড অবসর অধ্যয়ন এবং চিন্তাতে কাটাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। প্রতিদিন কাব্যগ্রন্থ লইয়া আমার পুষ্পকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। কল্পনা ধীরে ধীরে আসিয়া আমার মনকে বিশ্বরাজ্যের কত অনাবিষ্কৃত অমরাপুরীতে লইয়া যাইত! কত শকুন্তলা, কত বসন্তসেনা, কত রত্নাবলী, কত মহাশ্বেতা, কত জুলিয়েট্, কত মিরাণ্ডা আমার সেই ক্ষুদ্র নিকুঞ্জ গৃহখানির চারিদিকে উঁকি দিত। প্রাণ ভরিয়া কাব্যসুধা পান করিতে করিতে আত্মহারা হইতাম। মেঘমুক্ত আকাশের মধ্য দিয়া পাখী উড়িয়া যাইত—গ্রাম্য পথ দিয়া পথিক সুখ দুঃখের গান গাহিয়া চলিত; আমার মন চারিদিকের কোলাহল ও ব্যস্ততা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন এক অজানিত দেশে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিত!

এমনি একটী মধুর ললিতরাগের ধ্বনি লইয়া জীবনের নবউষা জাগরিত হইল। বিশ্বের নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্যমাধুরী আমার জীবন-প্রভাতে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

তার পর সহসা একদিন চাহিয়া দেখিলাম আমার হৃদয়-কাননের শত সহস্র কুসুম কাহার নূপুর শব্দে যেন বিকশিত হইয়াছে—কাহার মধুর স্পর্শে যেন স্তবকে স্তবকে অশোক কুরুবক নয়ন মেলিয়াছে।

সেদিন সমস্ত বিশ্ব বসন্তের পুলক কম্পনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মধুকণ্ঠ কোকিল সেদিন মধুর কূজন করিতেছিল; সমস্ত প্রকৃতি কোন এক অজ্ঞাত আনন্দে যেন নাচিয়া উঠিতেছিল। এমনি একটা সুমধুর স্মৃতিজড়িত নিশীথে সুকুমারী আসিয়া আমার হৃদয়ে আসন স্থাপন করিল। জ্যোৎস্না প্লাবনে সমস্ত জগৎ ভাসিয়া যাইতেছিল—নিশীথের সুপ্ত বক্ষ বাসরানন্দে আন্দোলিত হইতেছিল—এমনি সময়ে চারি চক্ষুর মিলন হইল।

হায়, আজ কত দিন পরে জীবনের সে পুণ্য মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িতেছে! সত্যই কি সেদিন একটী ব্রীড়াবনতা বালিকার কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে আমার জীবন তন্ত্রীর প্রতি আশা, প্রতি ভরসা মোহন ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছিল!

কি জানি কি হইয়াছিল! তবুও যেন মনে হয় কোন সুখ যেন অতীতের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাই আজ জীবন-সন্ধ্যায় সেই কনককিরণময়ী ঊষার কথা ভাবিতেছি। কত দিন চলিয়া গিয়াছে; যে ভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম সে ভাবে তাহা শেষ করিতে পারিলাম না। মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোক নিবিড় ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে; শুধু মাঝে মাঝে সেই অন্ধকার অপসারণ করিয়া আমার সেই হাস্যময়ী স্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদের হৃদয়ে তখন বাসন্তিরাগ-রঞ্জিত প্রগাঢ় প্রেমাকাঙ্ক্ষা অঙ্কিত ছিল। প্রাণের মধ্যে তখন নবীন সূর্য্যের সুখস্পর্শ আলোক অনুভব করিতাম। কি এক অপূর্ব্ব মোহে আমরা সমস্ত বিশ্ব নূতন সৌন্দর্য্যে ভূষিত দেখিতাম। তখন বুঝি বনদেবী আমাদেরই জন্য কাননে পুষ্পাস্তরণ বিস্তীর্ণ করিত, মন্দ সমীরণ বুঝি আমাদেরই জন্য চম্পক সুগন্ধ বহন করিত। জীবনের সেই অভিনব ঊষা এমনি সুখে আরম্ভ হইল। কত সুন্দর পুষ্প বৃক্ষের সহিত আমাদের স্নেহ স্মৃতি

জড়িত হইয়া রহিল—কত শত উপল খণ্ডে আমার সুকুমারীর নাম অঙ্কিত রহিল!

(২)

আমাদের এ আনন্দের সঙ্গিনী ছিল রঙ্গিয়া। ক্ষুদ্র বালিকা তাহার হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহরাশি লইয়া সুকুমারীর পিতৃগৃহ হইতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। উত্তর পশ্চিমের কঙ্করময় ভূভাগে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার হৃদয় বঙ্গদেশসুলভ কোমলতায় পূর্ণ ছিল। পিতৃ মাতৃহীন রঙ্গিয়া বাল্যকাল হইতেই সুকুমারীর সঙ্গিনী। সুকুমারীর পিতা মাতা রঙ্গিয়াকে কন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন; উভয়ে এক বৃন্তে দুইটী অপরিস্ফুট কুসুম কোরকের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল।

জন্ম জন্মান্তরে বিস্মৃতপ্রায় কোনও স্নেহসূত্রে তাহাদের হৃদয় গাথা হইল কিনা জানি না, কিন্তু যে অপরিসীম স্নেহ, অন্তরের যে দেবভোগ্য সৌখ্য সম্বন্ধে তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল তাহা এ পৃথিবীর নহে স্বর্গের। রঙ্গিয়া সুকুমারীর হাসি মুখ দেখিলে প্রফুল্লমুখী হইত, আর তাহার মুখে একটু বিষাদ কালিমা দেখিলেই মলিনা হইত। আমাদের মিলনানন্দের মধ্যে সে চঞ্চলা গিরি-নির্ঝরিনীর ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া বেড়াইত। প্রতিদিন সুকুমারীর কেশরাশি "কুন্তলীনে" রঞ্জিত করিয়া দিত, তাহার চূর্ণ কুন্তল "দেলখোসে" সুবাসিত করিত। আমাদের মনে অভিমানের মধ্যে সে অযাচিতভাবে প্রণয়দূতীর অভিনয় করিত; সুকুমারীকে মনের মত সাজাইত। আড়াল হইতে আমাদের মিলন দেখিত। কিন্তু তাহার এ সকল বাহ্যিক স্নেহ পরিচয় ব্যতীত তাহার হৃদয়ের অন্তঃপুরে নিভৃতে যে সহস্র সহস্র পুষ্প প্রতিদিন মধুর আনন্দ-কিরণপাতে ফুটিয়া উঠিত তাহা লোক চক্ষুর অগোচর হইলেও দুর্লভ এবং আদরণীয়।

এইরূপে আমাদের জীবন কাটিতে লাগিল। তখন ভাবিতাম এ সংসার বুঝি কেবল সুখেরই স্থান, এখানে বুঝি কেবল প্রণয়ের অস্ফুট ও কোমল কপোত কূজন, এখানে বুঝি কেবল অসীম সৌন্দর্য্য এবং

বিশ্বের অনন্তকালব্যাপী সঙ্গীতই নিরন্তর বাজিতেছে। তখন জানিতাম না যে পৃথিবীর এ মিলনের মধ্যে কেবল একটা করুণ বিরহ-বেদনা জাগিতেছে, তখন জানিতাম না যে অনন্ত জীবন সঙ্গীতের মধ্যে কেবল মরণ ঝঙ্কারই বিরাজ করিতেছে। অবশেষে এমন দিন আসিল যেদিন জীবনের সে ভুল বুঝিলাম।

এক শারদীয়া পূর্ণিমা রজনীতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র "জলিবোট" খানি সরোবরে ভাসাইয়া দিলাম। শৈবাল বিকীর্ণ সরোবরতলে জোৎস্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, দাঁড়ের শব্দে সহসা জাগরিত হইল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় আরোহন করিয়া চঞ্চল বালিকার মত সরোবর বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। আমি দাঁড় টানিয়া বোটখানিকে মধ্য সরোবরে লইয়া গেলাম। দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া বসিলাম। সুকুমারী আমার বক্ষে মাথা রাখিয়া জোৎস্নামধুর গগন পানে তাকাইয়া রহিল। মন্দান্দোলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা আমাদের বোটে আঘাত করিতে লাগিল। আমার বক্ষে সুকুমারীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখ তাহার উপর চন্দ্রকিরণ ক্রীড়া করিতেছিল, দূরে পাপিয়ার নিশীথ সঙ্গীত মিশাইয়া যাইতেছিল। তীরে কুসুম কুঞ্জে আলো ও ছায়ার শুভ সম্মিলন। সেই আলো সেই ছায়া এবং তরঙ্গমালার সেই অস্ফুট ধ্বনিতে সেইখানে এক অপূর্ব্ব কাব্যের সমাবেশ হইয়াছিল।

ধীরে ধীরে সুকুমারী মাথা তুলিয়া বলিল—"প্রিয়তম, আমরা আমাদের জীবন-তরণী কি এমনি মধুর জোৎস্না মধ্যে বাহিয়া লইয়া যাইতে পারিব?" আমার মনে কি হইতেছিল? আমি দেখিতেছিলাম এমন মধুর সংসার, এমন মধুর রজনী ঐ দূরাবলম্বী কালো একখানি মেঘ উহা কি এক মূহুর্ত্তে এই জোৎস্না এই আলো নিভাইয়া দিতে পারে না? সুকুমারী ধীরে ধীরে আবার বলিল—"প্রিয়তম, আমার কি ইচ্ছা হয় বলিব?" আমি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। সুকুমারী বলিল—"আমার ইচ্ছা হয় এই মধুর দৃশ্যে এমনি সময় এমনি করিয়া তোমার বক্ষে মাথা রাখিয়া মরি।" একটা শোকপূর্ণ হাহারব গগন বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। আমার চক্ষে জল আসিল!

সুকুমারী আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"ছি প্রিয়তম, কাঁদিও না; তোমায় ছাড়িয়া যাইতে কি আমার ইচ্ছা হয়?"

(৩)

কিন্তু জানি না সেই রাত্রি হইতেই আমার মন যেন কেমন উদাস হইল। সুকুমারীর প্রতি হাসি প্রতি কথাতে যেন একটা বিষাদের সুর অনুভব করিতাম। মনে হইত আমার হৃদয়ের একটা স্থান যেন অপূর্ণ হইতে চলিয়াছে। সুকুমারীকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতাম। সুকুমারীও আমার মনের দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত; কিন্তু সেই পূর্ণিমা রজনীতে আমার হৃদয়ে যে কালিমা পড়িয়াছিল তাহা আর কিছুতেই অপসৃত হইল না।

সুখের অবসরে দুঃখের চিন্তা করিতে করিতে পৃথিবীর উপর দিয়া একটী বৎসরের তরঙ্গ চলিয়া গেল। কোন সুখসুপ্ত হৃদয়ে বিষাদের জাগরণ আসিল, কোন পুষ্পময় উপবন দগ্ধ হইল, কোন মাধবী লতিকা ছিন্ন হইল, তাহা দেখিবার জন্য বর্ষ-তরঙ্গ থামিল না; ধীর গতিতে অনন্ত কাল-সাগরে গিয়া মিশিল।

বর্ষ শেষে আমি চাহিয়া দেখিলাম আমারও মধুস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। পূর্ণ বরষার যৌবন প্লাবন শেষ না হইতে হইতে সুকুমারী শয্যা শায়িনী হইল সুখস্নাত ধরণীর বক্ষে শরতের প্রস্ফুট আলোক না পড়িতে পড়িতে আমার সোনার পিঞ্জরের সোনার পাখী সোনার দেশে উড়িয়া গেল।

জীবনের মাধুরী লইয়া সুকুমারী চলিয়া গেল। বিবাহ বাসরে যে মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল সেই পুষ্পময়ী মূর্ত্তি লইয়াই চলিয়া গেল। মৃত্যুর কালিমা তাহার বদন স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই মুখ অম্লান, উজ্জ্বল,—এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময়ও একবার আমার দিকে ফিরাইয়াছিল। যৌবনের পরিপূর্ণ বসন্তে—জীবন-বল্লরীর একটী পল্লব, একটী কুসুম না ঝরিতে ঝরিতে ইহ জগৎ হইতে প্রিয়তমা অপসৃত হইল।

সুকুমারী গেল। এই অনন্ত জগৎ, তাহার মধ্যে আমি একা!

এই অনন্ত আলোকময়ী ধরনী; আমার চক্ষে তাহা অন্ধকার। ভাবিয়াছিলাম সুকুমারী গেলে আর বাঁচিব না। তবু হায়, বাঁচিতে হইল—তবু হায়, সংসারের শত শত ক্ষুদ্র কাজের মধ্যে শান্তি অন্বেষণ করিতে হইল।

ভগ্ন হৃদয়া রঙ্গিয়া সুকুমারীর শয়নগৃহ তেমনি করিয়া সাজাইয়া রাখিল। সুকুমারীর প্রিয় জিনিসগুলি যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিল; তাহার বড় আদরের "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" তাহার সজ্জা টেবিলের উপর তেমনি ভাবে স্থাপন করিল। আর যে বাতায়ন পাশে বসিয়া উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের কথা বিনিময় করিত, সেই বাতায়ন তলে ধুল্যাবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি বহুবায়ে শয়নগৃহের সন্মুখস্থ উদ্যানে সুকুমারীর একটী মর্ম্মর মণ্ডিত সমাধি স্তম্ভ স্থাপন করিলাম। রঙ্গিয়া তাহার চারিদিকে পুষ্প বৃক্ষ রোপণ করিল।

আমি আমার দাব দগ্ধ হৃদয় লইয়া এই বিজন গৃহে কিছুতেই বাস করিতে পারিলাম না। আমার শূন্য পুরীর মধ্যে একটা বিষাদ সঙ্গীত অবিরত ধ্বনিত হইত। সুকুমারীর সমাধিস্তম্ভ কেবল জীবনের একটী পুণ্য অবসরের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। যেদিকে চাহিতাম সেই দিকেই কেবল বিরহের একটা হাহারব শুনিতে পাইতাম। অনন্ত কালের গতি কেবল অশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল। আবার সেই শরতের প্রথম প্রভাত আসিল। শতদল শ্রী, গ্লানিধৌতা ধরণী আবার শারদ প্রভাতের অরুণ কিরণে হাসিতে লাগিল। সেকালে নিকুঞ্জ, শস্য শীর্ষ, তটিনীর বক্ষ এবং বিহগকণ্ঠ সে হাস্য-হিল্লোলে নাচিয়া উঠিল। আমি এই নব শোভাময়ী ধরণীর শোভার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল ক্লেশ নিমগ্ন করিবার আশায় বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

(৪)

অনেক স্থান ভ্রমণ করিলাম, অনেক স্থানে শান্তি অন্বেষণ করিলাম; কোথাও পাইলাম না। কোথায় সেই হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখর, কোথায় সেই শ্যামসীমা সাগরবেলা, কোথায় সেই মোগলের

গৌরব ও পতনের ইতিহাস ভূমি, কোথায় রাজপুত বীরের কীর্ত্তিস্থল! কোথাও শান্তি পাইলাম না। আবার দেশে ফিরিলাম।

গভীর নিশিথে বাসগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। সমস্ত প্রকৃতি যেন অৰ্দ্ধ ছায়া এবং অৰ্দ্ধ আলোকে একখানি অপূৰ্ব্ব চিত্রপটের মত দেখাইতেছিল। আমি ধীরে ধীরে সুকুমারীর সমাধি স্তম্ভের দিকে অগ্রসর হইলাম। ভাবিলাম, এই জীর্ণ হৃদয়খানি একবার সুকুমারীর সমাধি পাশে স্থাপন করিয়া শীতল হইব।

ধীর পাদবিক্ষেপে চলিলাম। অদূরে পুষ্পবিতানে সুকুমারীর সমাধি-স্তম্ভ; পাশে চন্দ্রালোকে অসংখ্য ছায়ার সম্পাত—আর সেই মর্ম্মর মণ্ডিত স্তম্ভ ধারণ করিয়া কে ঐ আলুলায়িতকেশা রমণীমূর্ত্তি?

সহসা সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই রমণীমূর্ত্তি গাহিয়া উঠিল:—

"সইরে না মিটল পিয়াস হামারি।"

স্বরের প্রতি লহরীতে যেন কোন অজ্ঞাত হৃদয়বেদনার ব্যাকুল মূর্চ্ছনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই নিশীথ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল।

আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলাম। কে গাহিতে ছিল তাহা দেখিবার অবসর হয় নাই। সঙ্গীত থামিলে গায়িকার মুখের পানে অস্ফুট চন্দ্রালোকে চাহিলাম; দেখিলাম সমাধিস্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রঙ্গিয়া।

রঙ্গিয়ার নাম ধরিয়া ডাকিলাম; রঙ্গিয়া উত্তর না দিয়া আকাশে দুইটী চক্ষু স্থাপন করিয়া ভাস্কর-খোদিতা পাষাণময়ী মূৰ্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। রঙ্গিয়াকে আবার ডাকিলাম—রঙ্গিয়া আবার গাহিয়া উঠিল—"সইরে না মিটিল পিয়াস হামারি।"

বালিকা থামিল! গগন প্রান্তে চক্ষু তেমনিভাবে স্থাপন করিয়া ভাস্কর-খোদিতা পাষাণময়ী মূৰ্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি বালিকার ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমাদের পুরাতন ভৃত্যকে ডাকিলাম। বিষণ্ণ বৃদ্ধ আসিয়া বলিল—"রঙ্গিয়া কয়েক দিন পাগল হইয়া গিয়াছে।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি সেই আকাশনিবদ্ধদৃষ্টি বালিকার মুখে এক মহিমা মণ্ডিত দেবীত্ব দেখিলাম। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে, সেই অর্দ্ধস্ফুট আলোকে, সেই মন্দান্দোলিত পুষ্পকুঞ্জ পাশে আমি মূর্ত্তিমতী বিরহব্যথা দেখিলাম। স্পর্দ্ধা করিয়াছিলাম আমার মত বুঝি কেহ সুকুমারীকে ভালবাসিতে পারে নাই; আমার সেই গর্ব্ব দূর করিবার জন্য বুঝি রঙ্গিয়া মনুষ্য জীবনের অমূল্যনিধি যে জ্ঞানরত্ন তাহা অন্তর হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া প্রিয়জনকে উপহার দিল। প্রেমের এই আত্ম-বলিদান দেখিয়া আমার হৃদয় বিস্ময় ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইল; আমি ভক্তিপূর্ণ অন্তরে সেই বালিকাকে প্রণাম করিলাম।

আজও এই শূন্যপুরীর মধ্যে আমরা দুইটী প্রাণী বাস করিতেছি। প্রভাতে, নিশীথে, প্রদোষে রঙ্গিয়ার কণ্ঠে এবং আমার অন্তরে সেই এক বিরহ রাগিনী বাজিতেছে "সইরে না মিটিল পিয়াস হামারি।"

শ্রীকুলদাকান্ত ঘোষ

ঘোগাসার "কুসুম কুটীর" ভাগলপুর।



ষষ্ঠ পুরস্কার ৫৲

শোভা।

অনেক দিন হইল সংবাদ পত্রে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল ; বিজ্ঞাপনটী এই—

"গত বৈশাখ মাসে রামচন্দ্রপুর গ্রাম হইতে একটী বালিকা হারাইয়াছে। বালিকার নাম শোভা, বয়স দশ বৎসর, রঙ্ ফরসা ; গঠন কিছু কৃশ ; বালিকার বাম বাহুতে কাটিয়া যাওয়ার একটী ক্ষুদ্র দাগ আছে ; বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছু কিছু জানে। যিনি এই বালিকাটীকে অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তিনি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবেন। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকটে সংবাদ দিতে হইবে।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র—রামচন্দ্রপুর"

প্রথম বিজ্ঞাপনের তিন বৎসর পরে, আবার বিজ্ঞাপন দেখা গেল,—

"অদ্য তিন বৎসর হইল রামচন্দ্রপুর হইতে শোভা নাম্নী একটী বালিকা হারাইয়া যায়। তদ্বিষয়ে—সালের—মাসের—তারিখের কাগজে, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশের কিছুদিন পরে, সেই বালিকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, একখানি ডাকের পত্র প্রাপ্ত হন ; পত্রে লেখা ছিল 'জগদীশ্বরের কৃপায় আপনার ভগিনী অতি নিরাপদ স্থানে আছেন। এখন আপনাকে কিছু জানাইতে পারিলাম না, কিছুদিন পরে সমস্ত জানিতে পারিবেন ; ব্যস্ত হইবেন না, যাহা হউক আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বালিকার অন্য কোনও সংবাদ পাই নাই ; বিনীত নিবেদন লেখক যিনিই হউন, অনুগ্রহপূর্ব্বক বালিকার সবিশেষ সংবাদ দিবেন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র—নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।"

উপরোক্ত বিজ্ঞাপন বাহির হইবার দুই সপ্তাহ পরে, সংবাদ পত্রে আবার বিজ্ঞাপন দেখা গেল,—

"মাননীয় শচিন্দ্র বাবু, কালিকাপুরের জমিদারদিগের বাটীতে অনুসন্ধান করিলে আপনার বিজ্ঞাপিত রামচন্দ্রপুরের হারানো বালিকা সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।"

এই বেনামী বিজ্ঞাপনে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে যাহা হইল তাহা ক্রমে বলিতেছি।

(২)

এক দিন সন্ধ্যার সময় দুইটী নবীন যুবা কালিকাপুর জমিদার বাড়ীর সদর দেউড়ীতে আসিয়া বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। দরওয়ান তাঁহাদের কার্ড লইয়া বাবুর কাছে গমন করিল এবং কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া যুবকদ্বয়কে লইয়া জমিদার বাবুর পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইল। জমিদার বাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া 'বেঙ্গলি' কাগজ পড়িতেছিলেন, দরওয়ান তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কালিকাপুরের প্রাচীন জমিদার রোহিণীকান্ত রায় বাহাদুর প্রায় পাঁচ বৎসর হইল পুরলোক গমন করিয়াছেন; তাঁহার একমাত্র পুত্র আশুতোষ রায় বাহাদুরই এখন 'জমিদার বাবু'। যুবকদ্বয় দেখিলেন জমিদার বাবুর বয়স বাইশ তেইশ বৎসর; আকৃতি পরম সুন্দর। আশুতোষ বাবু নিজে উঠিয়া, সহাস্য মুখে আগন্তুকদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিলেন।

প্রথম শিষ্টাচার ও দুই এক কথার পরে আশুতোষ বলিলেন "মহাশয়, আপনাদের মধ্যে যিনি শচীন্দ্র বাবু, তাঁহাকে বোধ হয় আমি চিনিয়াছি; আপনিই শচীন্দ্র বাবু?" বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রনাথ বলিলেন, "মহাশয় যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেন, তখন আমি কোন কোন দিন আপনাকে দেখিয়াছি—সে অপরিচিতরূপে দূর হইতে দেখিয়াছি, আমি নিজে সিটি কলেজের ছাত্র; এরূপ স্থলে আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য!" হাসিয়া

আশুতোষ বলিলেন "আপনার মুখ দেখিয়া—আপনার মুখে আপনার ভগিনী শোভার সাদৃশ্য আছে বলিয়া এত সহজে চিনিলাম।"

তখন অন্য কথা ভুলিয়া সোৎসুকে, কাতর কণ্ঠে শচীন্দ্র বলিলেন "মহাশয়, আমার ভগিনী শোভা কোথায় আছে? আমার সঙ্গে আমার পরম বন্ধু যোগেশ বাবু; উঁহার কাছে আমার সকল কথাই প্রকাশ্য।" প্রসন্ন মুখে আশুতোষ বলিলেন "আপনার ভগিনী আমাদের বাড়ীতেই আছেন, তাঁহার মুখেই আপনি তাঁহার সকল কথা শুনিতে পাইবেন।"

তখন চাকরে আলো লইয়া চলিল, তাঁহারা দুই তিন মহল পার হইয়া অন্দর মহলে উপস্থিত হইলেন।

(৩)

দোতলার উপরে একটী সুন্দর ঘর; ঘরের দেয়ালে সবুজ রঙের লতা, পাতা ও সোনালী ফুল; সে সব এত সুন্দর যে সহসা ঘরটীকে একটী কুঞ্জবন বলিয়া মনে হয়! সেখানে সেজের আলোতে বসিয়া একটী মেয়ে—তাহার বয়স কিঞ্চিদধিক তেরো বৎসর হইবে সে রঙ্ ও তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছিল; সেই ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ঝি বলিল "বাবু আর দুজন নোককে সাথে কোরে আস্‌চেন দিদিমণি" বালিকা ব্যস্ত হইয়া তুলি ছাড়িয়া উঠিতেছে, সেই সময়ে শচীন্দ্র তাহাকে দেখিলেন। শচীন্দ্র দেখিলেন, স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ কলিকার মনোহর সৌন্দর্য্যে ফুলবাগান যেমন আলো হয়, বালিকার সুকুমার সৌন্দর্য্যে সে ঘরও তেমনি আলো হইয়াছে! শচীন্দ্র মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

শচীন্দ্রকে নিতান্তই "বাকুব" দেখিয়া, আশু বাবু বলিলেন "ঘরে আসুন, শচীন বাবু, ইনিতো আপনারই সহোদরা"।

শচীন্দ্র অবাক! ঐ কি শচীন্দ্রের সহোদরা? তিন বছরে তিন যুগের পরিবর্ত্তন? অই কি সেই শোভা?—শচীন্দ্র ঘরে ঢুকিবেন কি, তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতাও যেন চলিয়া গিয়াছে!

দাদাকে দেখিয়া হৃদয়ের পূর্ব্বোচ্ছাস ভরে বালিকা বিবশা হইয়া পড়িল; তাহার সোণা মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল; চোখে জল আসিল, কাঁপিতে কাঁপিতে, ঘামিতে ঘামিতে, সে দাদার পদতলে প্রণাম করিল।

তখন. ভগিনীর প্রণামটী লইয়া আর তাহার অশ্রুসিক্ত রাঙ্গা মুখখানি দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিলেন। শোভার মাথায় হাত বুলাইয়া, তাহার হাত খানি ধরিয়া তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতা ভগিনীকে অবসর দিয়া আশু বাবু অন্য সকল লোকদিগকে লইয়া বিদায় লইলেন।

(৪)

অনুজাকে নির্জ্জনে পাইয়া শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি বাড়ী থেকে চলে এলে কেন শোভা? এতদিন কোথায় ছিলে? আর এখানেই বা কি করে এলে?"

আবার চোখের জল মুছিয়া, উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংযত করিয়া শোভা বলিতে লাগিল "দাদা! সেই যে মা'র শ্রাদ্ধ শেষ ক'রে তুমি কলকেতায় চলে গেলে, সেই যে আমায় বলে গেলে 'ছোট মা আমাদের বিমাতা হলেও তুমি তাঁকে খুব ভক্তি করিও। আমাদের দুভাই বোনের বাপ নাই, মাও মারা গেলেন, এখন ছোট মা ভিন্ন আর কেউ নাই, এই কথা ভেবে ছোট মাকে ভক্তি করবে। এই রকম কোল্লেও যদি ছোট মা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন, তা হ'লে আমার কাছে তুমি চিঠি লিখো, আমি তোমায় কোল্‌কাতায় নিয়ে এক বন্ধুর বাড়ীতে রাখ্‌বো।' সে সব কথা আমি কখনই ভুল্‌তেম না; কিন্তু দাদা, আমি কি কোর্‌বো? ছোট মা ছুতায় নতায় আমায় মেরে মেরে আধ মারা কোত্তেন। আমি বাসন মাজতেম, ঘর নিকুতেম, পুঁটীকে দুধ খওয়াতেম, তবু ছোট মা বল্‌তেন 'সর্ব্বনাশি! শতেক খুয়ারি! কেবল বসে বসে গিল্‌বি!' আবার বোল্‌তেন 'তোর মা আমার হাড় জ্বালিয়ে গেছে, তুইও তো সেই রাক্ষসীর সন্তান! সতীন-কাঁটা আর কত ভাল হবি!' একদিন পূবের বাড়ীর ক্ষমা পিশী নাকি ছোট মাকে বলেছিলেন 'ছোট বোউ! তোর আক্কেল কি গা? শোভা অমন শান্ত মেয়ে তবু তুই বাছাকে মারিস্ বকিস্! তোর মত সৎমা'র মুখে আগুন; আমাদের সেজ বৌ দেখি সতীন পো, সতীন ঝিদের আপন পেটের ছেলে মেয়ের মত

যত্ন, আত্তি করে!' ছোট মা তাঁকে বেশী কিছু না বোলে বাড়ী এসে আমায় বোল্লেন 'হতভাগি! তুই মিট্‌মিটে ডাইন, তোর পেটে এত গুণ? পাড়ার লোকের কাছে আমার নামে লাগিয়ে বেড়াস্, আসুক তোর পাড়ায় লোক!' আমি কেবল কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেম 'না মা, আমি কারুর কাছে কিছু বলি নাই, অমনি তিনি আরো রেগে উঠ্‌লেন, বোল্লেন 'বলিস্‌নি বটে! এখন তোকে বাঁচায় কে দেখি, এই বয়সে তোর এতটা ন্যাকামি! দেখ্! আজ ও ন্যাকামি ভেঙ্গে দিচ্ছি!" এই কথা ব'লে আমায় চড় কিল লাথি মাত্তে লাগ্‌লেন; আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো; ভয়ে আর যাতনায় আমি খুব কেঁদে ফেল্‌লেম। অমনি ছোট মা আমার মুখের ভিতর কাপড় পূরে দিয়ে বোল্লেন 'ফের যদি তুই চেঁচিয়ে কেঁদে পাড়ার লোক জানা-জানি কোর্‌বি, তবে এখুনি তোকে যমের বাড়ী পাঠাব।' ভয়ে কাঁদতেও পেলেম না! তারপর দিন তোমার কাছে একখানা চিঠি লিখে ডাকে দেবার জন্য রামা চাকরের হাতে দিলেম। গোপালদাদা তাই দেখে রামাকে বোল্লেন 'ও হিজি বিজি লেখা, আমি সেরে ভাল করে দিচ্ছি' এই কথা বোলে তিনি চিঠি খানি নিয়ে ছোট মাকে দেখালেন! আমি তাতে লিখেছিলাম 'দাদা! ছোট মা আমায় রাত দিন মারেন, আমি এখানে আর থাক্‌বো না, তুমি আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে যাও' এই লেখা দেখে ছোট মা একেবারে আগুনের মত হয়ে উঠ্‌লেন, আমায় বোল্লেন 'ও পোড়া কপালি! তুই যে বড় সাঁউখুড়ি কোল্লি, আ মরি! পাড়ার লোকের কাছে কিছু বলিনি, এই যে দাদার কাছে আমার নামে লাগিয়ে চিঠি লিখ্‌লি কেমন করে? তা তোর দাদার যা' সাধ্যি থাকে করুক না; থানায় গিয়ে পুলিশ এনে তোদের কি না কোত্তে পারি! দেখ্‌বি তবে? যমের বাড়ী পাঠাব তোকে?' এই সব বোল্‌তে বোল্‌তে একখানা মাছ কোটা বটী নিয়ে আমার দিকে ছুট্‌লেন।'' শচীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া সশঙ্কিত চিত্তে বলিলেন কি সর্ব্বনাশ! তার পর শোভা, তার পর?"

শোভা বলিতে লাগিল "আমি তখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিইছি;

রামা চাকর তাই সব দেখে 'মা ঠাকরুণ করেন কি, করেন কি,' বলে আমার হাত ধোরে হিড়্ হিড়্ করে টেনে বাড়ীর বাইরে গেল; তখন আমায় বোল্লে 'দিদিমনি, এখন পালাও, এর পর মা'ঠাকরুণের রাগ পোড়্‌লে আমি তোমায় নিয়ে যাব' আমি রামার কথা শুনে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নদীর দিকে চোল্লেম।" নিঃশ্বাস ফেলিয়া শচীন্দ্র বলিলেন, "তবে রামাই তোমার জীবন রক্ষা কোরেছে! তারপর?"

শোভা বলিতে লাগিল "তার পরে দেখি নদীর কূলে আম তলায়, একটী বাবু দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখ্‌ছেন।—ঘাটে একখানি বড় বজরা বাঁধা রয়েছে। আমাকে কাঁদ্‌তে দেখে তিনি কাছে ডাকলেন; তাঁর মিষ্ট কথা শুনে আমিও তার কাছে গেলাম। সে বাবুটী যখন আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তখন আমি সব কথাই তাঁকে বোলে ফেল্লেম; তার পরে বোল্লেম 'আমার দাদা আমায় কল্‌কেতায় নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু ছোট মা কখন আমায় মেরে ফেল্‌বেন দাদাকে দেখ্‌তেও পাব না' বাব আমার কথা শুনে চোখ মুছ্‌লেন, তার পরে বোল্লেন 'তোমার দাদার নাম কি? তিনি কি করেন?' আমি বোল্লেম 'দাদার নাম শচীন্দ্রনাথ মিত্র, তিনি বি, এ, পড়েন' তখন বাবুটী বোল্লেন 'আমি তোমার মনের কথা বুঝেছি। আমি এই বজরায় কল্‌কেতায় যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমার দাদার কাছে তোমায় পৌঁছিয়া দিব।' অনেক দিনের পর স্নেহের কথা শুনে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আমি পরমানন্দে তাঁর বজরায় উঠ্‌লেম, তার পরে কল্‌কেতায় এলেম।

জমিদার বাবুর সঙ্গে আমি সেখানে গিয়া দেখি, জমিদার বাবুর মা সেখানে আছেন। তিনি আমাকে দেখে যার পর নাই সুখী হোলেন। জমিদার বাবু তোমার মেসের ঠিকানায় লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তুমি বাসা পরিবর্ত্তন করেছিলে বলে সেসময় তোমায় খুঁজে পেলেন না। এদিকে জমিদার বাবুর মা সব কথা শুনে আমায় নিজের কোলের উপর বসিয়ে বোল্লেন 'শোভা, আমার একটি মেয়ে ছিল, সে মারা-গিয়াছে; তুমি এখন আমার সেই মেয়ের মত আমার কাছে থাকো;

আর একটু বড় হ'লে তোমার দাদাকে খবর দেব, আমি সে আদর ঠেল্‌তে পাল্লেম না।—সম্মত হোলেম। পরদিন তিনি জমিদার বাবুকে বোলে আমাকে লেখা পড়া, সেলাই, ছবি আঁকা, বাজনা ইত্যাদি শেখাবার জন্য তিনজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে দিলেন; আমার জন্য গহনা ও পোষাক এনে দিলেন; আমি রোগা ছিলেম বলে আমায় কত ওষুধ, পথ্য খাওয়া'তে লাগ্‌লেন, অযত্নে আমার চুল পাত্‌লা আর কটা ছিল ব'লে কুন্তলীন তেল এনে মাথা'তে লাগ্‌লেন; তাই জন্য দেখ দেখি দাদা, এখন আমি কত মোটা সোটা হয়েছি, আর আমার মাথায় কতটী চুল হয়েছে!"

শোভার আত্মকাহিনী শুনিতে শুনিতে শচীন্দ্রের চক্ষে অনেকবার অশ্রু আসিয়াছিল; তাহার শেষের কথাটী শুনিয়া, সেই সরলতা মাখা মুখে বালিকার হাসি দেখিয়া শচীন্দ্রও হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন "সত্য কথা শোভা, তোকে আমি প্রথমে চিনিতেই পারি নাই! সে কথা যাক, এখন কথা এই যে জমিদার বাবুরা মানুষ না দেবতা?"

ইহার পরেও দুই ভাই ভগিনীতে কত প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় কথা হইতে লাগিল; তাহারা কতই কাঁদিল, কতই হাঁসিল!

(৫)

সন্ধ্যার পরে, পাঠাগারে বসিয়া জমীদার আশু বাবু, সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন, শচীন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে শোভাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিনীত প্রার্থনা করিলেন। আশু, কাগজ কলম না ফেলিয়া, চক্ষু না উঠাইয়া, অম্লান মুখে বলিলেন "আপনার ভগ্নীর অনুসন্ধান জন্য পুরস্কার প্রতিশ্রুত আছেন, আমি পুরস্কৃত না হইলে আপনার কথায় সম্মত হইব কেন?" শচীন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন কর্ত্তব্য পালনের জন্য পুরস্কার কে কবে পাইয়াছে? আশুতোষ ক্ষণকাল তাঁহার আয়ত নয়ন যুগল শচীন্দ্রের মুখের উপরে রাখিলেন, পরে বলিলেন "তবে বুঝি আপনার হিসাবে যে কর্ত্তব্য পালন করে পুরস্কার যোগ্য নহে, আর যে অকর্ত্তব্য করিতে পারে, সেইই পুরস্কার পায়?" শচীন্দ্র হাসিলেন, কি উত্তর দিবেন, ভাবিতে লাগিলেন।

তখন রচনাটী চাপা দিয়া, দোয়াত কলম সরাইয়া, 'দেলখোস্' সিক্ত রুমালে কপাল মুখ মুছিয়া আশুতোষ বলিতে লাগিলেন "শচীন বাবু! এতদিন ঐশ্বর্য্য ভোগে বা সাংসারিক সুখে আমার প্রবৃত্তি ছিল না, আমি ভাবিয়াছিলাম আমার পিতৃমাতৃ হীন ভাগিনেয়দিগকে এই সম্পত্তি দান করিয়া, মুক্ত বিহঙ্গের মত আমি ভগবানের সেবা করিয়া বেড়াইব; সেইজন্য এতদিন বিবাহ করি নাই; কিন্তু আমার মায়ের কাতরতা আর সহিতে পারিতেছি না—আমার মা শোভাকে তাঁহার পুত্রবধূ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন, আমার মার সাধ পূর্ণ করুন, তাহাই আমার পুরস্কার।"

শুনিয়া শচীন্দ্র আনন্দে অধীর হইলেন, খানিকক্ষণ কথা বলিতে পারিলেন না; তথাপি তিনি আত্ম সম্ভ্রম হারাইলেন না, বলিলেন কালিকাপুরের জমিদার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য অনেক রাজ কন্যা আগ্রহান্বিতা আছেন, দরিদ্র বালিকা শোভার জন্য জমিদার মহাশয় সে গৌরব হারাইবেন কেন?" আশুতোষ বলিলেন "শোভা দরিদ্র হইলেও দেববালা; সে যদি আমার মাতৃদেবীর পুত্রবধূ না হয়, তবে আর কেহই হইবে না, তাহা নিশ্চিত জানিবেন।"

শচীন্দ্র আর কি বলিবেন?

ইহার পরদিনই জমিদার বাড়ীতে বিবাহের উৎসব আরম্ভ হইল। যথাকালে শচীন্দ্র, আশুতোষের হস্তে স্নেহের ভগিনী শোভাকে সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের সময়ে উভয় পক্ষের বহুতর আত্মীয় কুটুম্ব সমাগত হইয়াছিলেন, কেবল শোভার বিমাতা হিংসার আগুণে পুড়িয়া মরিলেন! আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, তিনি অনাহারে তিন দিন শয্যাগত থাকিয়া তাঁহার বামুন ঠাকুর ও ঝিকে বলিয়াছিলেন "সে পোড়া-মুখীর এত সুখ ঐশ্বর্য্য হওয়ার চেয়ে আমার মরণ হওয়া ছিল ভাল!"

শ্রী মানকুমারী বসু,
সাগরদাঁড়ি, যশোহর।



সপ্তম পুরস্কার ৫১

গহনার বাক্স।

আমি ডিটেক্‌টিভ্ আফিসে প্রবেশ করিবার প্রায় ছয় মাস পরে, একদিন বড় বাবু আফিসের সেই নির্জ্জন কক্ষে আমাকে ডাকিয়া, বর্দ্ধমানের এক ভয়ানক খুনের আমূল পরিজ্ঞাত ঘটনা বিবৃত করিলেন, এবং এই হত্যা সম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজ পত্র আমার হাতে দিয়া তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়া তথায় গুপ্ত হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রায় তিন সপ্তাহ বর্দ্ধমানে অবস্থান করিলাম, হত্যা স্থানের চারি দিকের অধিবাসিগণের সহিত তৎপ্রসঙ্গে অনেক আলাপাদিও করা গেল, কিন্তু হত্যাকারীর বিশেষ কোন সন্ধান পাইলাম না। তবে স্থানীয় পুলিশ ভূষণদাস নামক যে জনৈক হোটেল ওআলাকে এই হত্যা ব্যাপারের সহিত জড়িত বলিয়া যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট এবং স্থানীয় অধিবাসিদের নিকট বেশ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তা' ছাড়া আমি ভূষণদাসের হোটেল ঘর অনুসন্ধান করিয়া যে তিনখানি গোপনীয় পত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে উক্ত ব্যক্তিই যে প্রকৃত হত্যাকারী তাহাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও, ভূষণের আবাসস্থান স্থির করিতে পারিলাম না, হত্যাকাণ্ডের দিন হইতে সে নিরুদ্দেশ!

এই প্রকার অবস্থায় তথায় অবস্থান করা বৃথা এবং কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আর অধিককাল আমায় সেখানে থাকিতে হইল না, অবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশসহ বড় বাবুর একখানি টেলিগ্রাম্ পাইলাম। বাঁচা গেল, সেই দিনই পূর্ব্বাহ্ণে

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম, হত্যাকারীর অনুসন্ধান এই খানেই শেষ হইয়া গেল।

চারিটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া, বাসায় না গিয়াই আমার ত্রিসপ্তাহিক অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল, সেই ভূষণদাসের জীর্ণ ও নীরস চিঠি কয়েকখানি সহ একেবারে আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং আমার অনুসন্ধানের আমূল বিবরণ বিবৃত করিলাম।

আমার কথায় বাবু বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না, তিনি ধীরভাবে বলিলেন,—"বৰ্দ্ধমানের হত্যাব্যাপারের শেষ যে এই দাঁড়াইবে, তাহা প্রথমে পুলিশ রিপোর্ট হইতেই বুঝেছিলুম্, তবুও একবার দেখা গেল। যাহা হউক তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে; কালই তোমাকে দেওঘরে যেতে হবে। আজ কয়েক দিন হ'ল সেখানে বনমালী চৌধুরী নামক জনৈক বড় লোকের বাড়ীতে অনেক টাকার গহনা চুরি হয়ে গেছে; তার অনুসন্ধানের জন্য একটা লোক পাঠাইবার জন্য তিনি স্বয়ং আমাকে লিখেছেন। তোমাকেই যেতে হবে।"

অবিলম্বেই দেওঘরে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে বড় বাবু আবার বলিলেন,—"দেখ এই চুরি ব্যাপারটা একটু নূতন রকমের! বাড়ীর কর্ত্তার বিশ্বাস, তাঁহার পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত, এজন্য তাহাকে লইয়া একটা প্রকাশ্য গোলযোগ করা তাহার অভিপ্রেত নয়। যাহা হউক, তুমি সেখানে গেলেই সব শুনিতে পাইবে, কিন্তু খুব সাবধান।"

পরদিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেওঘরে পৌঁছিলাম। বনমালী চৌধুরীর বাড়ী অনুসন্ধান করিতে বিলম্ব হইল না, সহরে লোকটার বেশ মান প্রতিপত্তি আছে; শুনিলাম বহুকাল সরকারী আমীনের কায করিয়া পেন্‌সন্ প্রাপ্তির পর তিন চারি বৎসর হইতে তিনি সপরিবারে বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন। নগদ টাকা যথেষ্ট, এবং উচ্চ সুদে কৰ্জ্জ দিয়া তদ্দারাও প্রচুর আয়ের সংস্থান হয়। সন্ধ্যার পর বনমালী চৌধুরীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না; কর্ত্তা তখনও আহ্নিকের ঘরে

রহিয়াছেন, শুনিলাম বাহিরের ঘরে আসিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। দেখিলাম বাসায় লোক জনের সংখ্যা খুব অধিক নয়, একজন খানসামা, একজন বেহারা, একটী মুহুরী আর এক পাচক ব্রাহ্মণ। মুহুরীর নাম শ্রীশ্যামলাল রায়, লোকটা মিষ্টভাষী, আমাকে প্রথমে দেখিয়াই, অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাড়িত ঋণগ্রহণেচ্ছু বিপন্ন ব্যক্তি ঠাহরাইয়াছিলেন, এবং অচিরাৎ ভূসম্পত্তি বন্দক রাখিয়া আমি কর্ত্তার “মহামহিম” পদবীর প্রসার বৃদ্ধি করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থা করিব, তাহাতে আর তাঁহার সন্দেহ ছিল না। [illegible] [illegible]গোপনের এই সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না, দুই সহস্র মু[illegible] কর্ত্তার সাহায্য প্রার্থনা আমার আগমনের কারণ বলিয়া প্রকাশ করিলাম। লোকটা আমার কথায় বেশ বিশ্বাস করিয়া ফেলিল, এবং আশু কার্য্য সিদ্ধির তিনি যে বিশেষ সচেষ্ট থাকিবেন, একথা বলিতেও ছাড়িল না।

কর্ত্তা বাহিরে আসিলে, একাকী আমি তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে গিয়া, বড় বাবু প্রদত্ত আমার নিয়োগ পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি পত্রখানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া ধীরে ধীরে চসমাখানি খুলিয়া বলিলেন,—“সাহেব আপনাকে চুরির অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছেন, ভালই। অনুসন্ধান আরম্ভের পূর্ব্বে আপনাকে একটা কথা বলিয়া দেওয়া ভাল বোধ করিতেছি। আজ চারি দিন হ'ল আমার প্রায় পাঁচ হাজার টাকার গহনা চুরি গিয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত একথা গৃহিণী ব্যতীত অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, কেবল গোপনে পুলিশে একটা সংবাদ দিয়া রাখিয়াছি। আপনি আমার এই ব্যবহারের কথায় হয়ত বিস্মিত হইতেছেন, কিন্তু সব শুনিলে আমার সঙ্কট বুঝিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস অলঙ্কারগুলি আমার হতভাগা ভ্রাতষ্পুত্র রজনী চুরি করিয়াছে। গৃহিণীরও এই মত। হতভাগাকে, পিতার মৃত্যুর পর হতে ছেলের মত পালন করে আসিতেছি, লেখা পড়া শিখায়েছি,—”

আমি এইখানে তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম,—“মহাশয়, আপনার ভ্রাতষ্পুত্রের কথা পরে শুনিলেই চলিবে, এখন চুরিটা কিপ্রকারে হয়েছিল, আগে তাহাই বলুন।”

কর্ত্তা তখন বলিতে লাগিলেন,—"ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই চুরির দিন কতকগুলি গহনা বন্ধক রাখিয়া, কয়লা খাদের এক ঠিকাদার আমার নিকট তিন হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া গিয়াছিল, গহনাগুলা আমার এই বৈঠকখানা ঘরে একটা বড় হাত বাক্সে রাখিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি বশতঃ লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখা হয় নাই। এই ঘরে রাত্রিতে কেহই থাকে না, সেই হতভাগা, শুনিলাম সেদিন রাত্রে এখানে শুইয়াছিল। প্রাতঃকালে কি রাত্রে কখন সে উঠে গেছে, কেহ জানে না, আমি যথাসময়ে প্রভাতে উঠিয়া আর বাক্স দেখি নাই। চোর যে কে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, তাই একটা ঘরাও গোলযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, বাক্সটা আমি বাড়ীর মধ্যে রাখিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন যাহাতে বিনা গোলযোগে পরের অলঙ্কারগুলি হস্তগত হয়, তাহার উপায় করুন।"

বহুকষ্টে চুরির এই সামান্য ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া আপাততঃ পরিতৃপ্ত থাকিতে হইল, কারণ কর্ত্তার সহিত আর যাহা কথা হইল, তাহাতে ভ্রাতুষ্পুত্র রজনীনাথের উদ্দেশে অজস্র গালিবর্ষণ এবং নিজের আকস্মিক গ্রহবৈগুণ্যের জন্য অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ভিন্ন আমার ডিটেক্‌টিভি বুদ্ধি প্রয়োগের উপযোগী কিছু পাওয়া গেল না। সে যাহা হউক কর্ত্তার বিশেষ অনুরোধে, কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বাসাতেই থাকার ব্যবস্থা হইল। আত্মগোপন মানসে আমি যে প্রাণ গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া চাকরদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিলাম, সে কথাটা কর্ত্তাকে বলিয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে, আবার কর্ত্তার সহিত চুরি সম্বন্ধে অনেক কথপোকথন হইল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তির উপর সন্দেহ হয় কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন :—"আমার পরিবারস্থ মুহুরী, বেহারা, চাকর, ব্রাহ্মণ সকলই বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য। যে ব্যক্তি এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমি বহুপূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। আর কাহারও উপর আমার সন্দেহ নাই।"

সেই দিনই, ঘটনার পরিজ্ঞাত বিবরণসহ, বড় বাবুকে একখানি

পত্র লিখিলাম। লোকটা যখন ভ্রাতষ্পুত্রের উপর এতটা সন্দেহ করিতেছে, একবার তাহার অবস্থাটা অনুসন্ধান করা ভাল বলিয়া বোধ হইল; শুনিলাম সে বৈদ্যনাথের নিকটেই মধুপুর ষ্টেসনে কি একটা চাকরি করে, কিন্তু হঠাৎ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইল না। পত্রোত্তরে বড় বাবুর পরামর্শের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে, স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া কর্ত্তা যথারীতি মহাদেব দর্শন করিতে বহির্গত হইলেন এবং আমাকেও যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেসময়ে আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তা' ছাড়া বড় বাবুর চিঠিও পাইবার সম্ভাবনা ছিল, এই সকল কারণে, কোন প্রকারে কর্ত্তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, বাসাতেই থাকিয়া গেলাম।

সেদিন কর্ত্তা বাহির হইয়া যাবার কিছুক্ষণ পরেই মুহুরী মহাশয়ও একটা কাজে চলিয়াগেলেন। আমি একলা বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া কতকগুলি পত্র আমার হাতে দিয়া গেল। বড় বাবুর নিকট হইতে পত্র পাইবার সম্ভাবনা ছিল, আমি তাড়াতাড়ি সেই পত্র খুঁজিতে লাগিলাম. কিন্তু আমার নামীয় কোন পত্রই পাইলাম না। তখন আমি একে একে সেই পত্রগুলির শিরোনামা পাঠ করিতে লাগিলাম. কোন প্রকারে সময় ক্ষেপণ করা ব্যতীত এই কার্য্যের অপর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। পত্রগুলির মধ্যে শ্যামলাল রায় মুহুরী মহাশয়ের নামীয় একখানি চিঠি ছিল, তাহার শিরোনামা পড়িবার সময় লেখাটা যেন আমার কোনও পরিচিত লোকের বলিয়া বোধ হইল, ডাকঘরের ছাপ্‌টা বড় অপরিষ্কার পড়িতে পারিলাম না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বর্দ্ধমানের হত্যাকারী ভূষণদাসের লেখা কি এই প্রকার নয়? অনেক নিদ্রাহীন স্তব্ধরাত্রি ভূষণের কয়েকখানি পত্র নাড়াচাড়া করিয়া অতিবাহিত করিয়াছি, তাহার হস্তাক্ষরের প্রত্যেক টান্ তখনও আমার চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ ছিল। মুহুরী মহাশয়ের পত্রখানি যে সেই ভূষণদাস কর্ত্তৃক লিখিত তাহাতে আর আমার সন্দেহ রহিল না। পত্রগুলি অপ্রয়োজনীয় বোধে বড়

বাবুকে দিই নাই, সেগুলা আমার পোর্টম্যাণ্টোস্থ একটা জামার পকেটে ছিল। তাড়াতাড়ি বাক্স হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া তাহার অক্ষরের সহিত, মুহুরী মহাশয়ের নামীয় পত্রের শিরোনামার অক্ষরের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম অবিকল একই হাতের লেখা! অপর চিঠিগুলা টেবিলের উপর রাখিয়া, একটা নিৰ্জ্জন স্থানে গিয়া, সেই পত্রখানি খুব সাবধানের সহিত পড়িলাম। চিঠিখানি যশোহর হইতে প্রেরিত, লেখা ছিল :—

"কল্যাণবরেষু,—আমি কিছুদিন হ'তে তোমার পত্র না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি। পূজার জিনিষ পত্র সঙ্গে লইয়া আসিবে, এবং ছুটিতে আসিবার সময় কলিকাতায় গিয়া, শ্রীমতী মৃণালিনীর জন্য সেই বহুবাজারের এইচ্, বসুর এক শিশি কুন্তলীন, আর একশিশি দেলখোস, অবশ্য করিয়া আনিবে। শীতকালে সাহেব বিবির নাচ দেখ্তে, সে কলিকাতায় যাবে বলছে। সদর রাস্তায়, এইচ্, বসুর খুব বড় দোকান। গোবৰ্দ্ধন ভাল আছে, ঠাকুরের জ্বর হইয়াছে। কলিকাতার কাঠগোলায়, তোমার কাকার সহিত একবার দেখা করিও। আমি ভাল আছি।

আশীৰ্ব্বাদক
শ্রীকালীকান্ত রায়।

পুঃ—মিনি শীঘ্র বেশ্ লিখ্তে শিখেছে, সে কিছুতেই ছাড়্লে না, তার হিজিবিজি হাতের লেখা পত্রের সঙ্গে পাঠাইলাম, তুমি আসিলে ভাল লেখা দেখাইবে। কুন্তলীন ও দেল্‌খোস্ না আনিলে, বড় গোলযোগ বাধাইয়া তুলিবে।"

তারপর পত্রের সহিত মোড়ক করা একখণ্ড পৃথক কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা :—

"খ, চ, খ, ক, ক, গ, খ, জ, খ, ক, ঙ, খ, গ, ঙ, জ।"

পত্র পাঠ করিয়া প্রায় সকল আশাই নির্ম্মূল হইতে চলিল। কিন্তু ভূষণদাসের হস্তাক্ষরের সহিত চিঠিখানির প্রত্যেক অক্ষরের ঐক্যতা সহজে মন হইতে বিদূরিত হইল না, বিশেষতঃ বালিকাকন্যা মিনির যথেচ্ছা লিখিত আঁকা বাঁকা অক্ষরগুলিতেও যেন দুই একটা পাকা হাতের টান দেখিতে পাইলাম।

সে যাহা হউক চিঠিখানি, আর সেই ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড আমার নিকটেই থাকিল, মুহুরী মহাশয়ের প্রতি একটু খরদৃষ্টি রাখিলাম, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না। আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, আবার চিঠিখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম হটাৎ মনে হইল টুকরা কাগজে যে কয়েকটী অক্ষর লেখা আছে, হয়ত তাহার সাহায্যে পত্রখানি পড়িতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় আমার অনুমান ঠিক হইল, এবং এই কয়েকটী কথা তখন পত্রের মধ্যে স্পষ্ট পড়িতে পারিলাম। "আমি জিনিষ লইয়া কলিকাতায় বহুবাজারের দেলখোস বিবির গোবর্দ্ধন ঠাকুরের কাঠগোলায় আছি, শীঘ্র না আসিলে গোলযোগ"।

বর্দ্ধমানের হত্যাকারী ও দেওঘরের চুরীর সহায়ক ভূষণ দাসকে উক্ত পত্রস্থ লুক্কায়িত বাক্যদ্বারা ধৃত করিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, আমার মানসিক অবস্থা কিপ্রকার হইয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। আমি পত্রখানি সাবধানে পকেটস্থ করিয়া, কর্ত্তার নিকট গিয়া বলিলাম,—"আপনার চুরীর বোধহয় একটা কিনারা হইবে, আমাকে এখনই একবার মধূপুরে যাইতে হইবে। কথাটা যেন প্রকাশ না হয়।" গোলযোগের আশঙ্কায় আমার প্রকৃত গন্তব্যস্থান যে কলিকাতা তাহা আর প্রকাশ করিলাম না।

সাতটার গাড়িতেই যাওয়া স্থির করিলাম, দেখিতে দেখিতে ছয়টা বাজিয়া গেল, আমি কিছু অগ্রেই ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। যাইবার

সময় মুহুরী মহাশয় আমার হটাৎ গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম যেসকল সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কর্ত্তা আমাকে টাকা কর্জ্জ দিবেন, তৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্র ভুলে বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি, কল্যই দলিলপত্র লইয়া আবার ফিরিতেছি।”

প্রাতঃকালে কলিকাতায় পৌছিয়াই মুচীপাড়ার থানার ইনেস্পেক্টার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দশজন পুলিশ কনষ্টেবল্ সঙ্গে লইয়া দেল্‌খোস বিবির লেনে উপস্থিত হইলাম! গোবর্দ্ধন ঠাকুরের কাঠগোলা বাহির করিতে বিলম্ব হইল না, ভূষণকে সেনাক্ত করিয়া গ্রেপ্তার করাও সহজে হইয়া গেল, কারণ বৰ্দ্ধমানে অবস্থান কালীন তাহার আকারাবয়বের বিশেষত্বগুলি পরিচিত লোকদিগের মুখে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রথমে দেওঘরের চুরীর ব্যাপারের সকল কথাই ভূষণ অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তারপর হাজতে রাখিয়া দুই একটী তাড়া দিবার পর সে সকলই স্বীকার করিল এবং অপহৃত গহনাগুলিও কাঠগোলাতে পাওয়া গেল।

আমার এই অপরাধী ধরিবার আমূল ইতিহাস শুনিয়া বড় বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই রাত্রেই দেওঘরে যাত্রা করিয়া চৌর্য্য কার্য্যের সাহায্যকারী সেই মুহুরী শ্যামলাল রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই প্রকার অসম্ভাবিত উপায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া, শ্রমক্লিষ্ট ক্ষীণ শরীরে যেন চতুর্গুণ বল প্রাপ্ত হইলাম এবং একজন সাহায্যকারী ইনেস্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই পুনরায় দেওঘরে যাত্রা করিলাম।

পরদিন প্রাতে দশটার সময় দেওঘরে পৌছিয়া, স্থানীয় থানা হইতে কয়েকজন কনেষ্টবল্ সঙ্গে লইয়া, বনমালী চৌধুরীর বাসায় উপস্থিত হইলাম। শ্যামলাল রায় মুহুরী মহাশয় তখন একজন দেন্দারের সুদের হিসাব করিতেছিলেন; আমি তাঁহাকে আইন মত অপরাধের কথা বলিয়া গ্রেপ্তার করিলাম। এ কথা কর্ত্তার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। আমি তাঁহাকে পার্শ্বের ঘরে

লইয়া গিয়া, চুরীর আমূল ইতিহাস বর্ণন করিলাম এবং মুহুরী মহাশয়ের নামীয় সেই চিঠিখানিও দেখাইলাম। বলা বাহুল্য সেই পত্র হইতে কি প্রকারে আমি ভূষণ দাসের সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। তারপর "খ চ খ ক ক ইত্যাদি" অক্ষরাঙ্কিত সেই কাগজখণ্ডের সাহায্যে যে পত্রখানি পড়িতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম; বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর "খ" এর অর্থ প্রথম ছত্রস্থ দ্বিতীয় শব্দ "আমি" এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ণমালার ষষ্ঠ অক্ষর "চ" যে পত্রের দ্বিতীয় ছত্রস্থ ষষ্ঠ শব্দ "জিনিস" বুঝাইতেছে এবং এই প্রকারে যে পত্র পাঠ করিতে হইবে চৌধুরী মহাশয়কে বেশ বুঝাইয়া দিলাম। কর্ত্তা তখন স্বয়ং পত্রের প্রত্যেক ছত্র হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট শব্দগুলি বাহির করিয়া পত্র পাঠ করিয়া আমার বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

অপরাধী শ্যামলাল রায়কে হাজতে পাঠাইয়া, আমরা সেদিন চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে দেওঘরে অবস্থান করিলাম।

পরদিন কলিকাতায় গিয়া শুনিলাম, বৰ্দ্ধমানের হত্যাকারী এবং দেওঘরের চোর ধৃত করার পুরস্কার স্বরূপ, একটী সত্তর টাকা মাহিয়ানার পদে আমার উন্নতি হইয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।



অষ্টম পুরস্কার ৫৲

রেলে চুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাড়ে বারটার গাড়ীতে শেয়ালদহ ষ্টেসনে ট্রেনে চড়িলাম। স্লো পেসেঞ্জার ঢিকুতে ঢিকুতে চলিতে লাগিল। গাড়ীতে বসিয়া মনে মনে উত্তরাঞ্চলবাসীদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছিলাম। সেখানকার কোন এক বুদ্ধিমান জমীদার মহাশয়ের গৃহে এক জন সন্ন্যাসী কৃপা করিয়া পদধূলি দিয়াছিলেন। সাধু-সেবাপ্রিয় জমীদার দুই দিন কায়-মনোবাক্যে সাধুসেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিতেছিলেন। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং দক্ষিণাস্বরূপ জমীদারের ক্যাশ বাক্সটী লইয়া গিয়াছেন। আমার কর্ম্মভোগ ছিল, সেইজন্য জমীদার মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তার ফল আমাকেও কিছু ভোগ করিতে হইতেছে, কারণ সেই অন্তর্হিত সন্ন্যাসী মহাশয়কে খোজ করিবার কার্য্যটা আমার উপরেই পড়িয়াছিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেহারা সম্বন্ধে জমীদার যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে জ্ঞাত হইয়াছি সন্ন্যাসীর বর্ণ সাধুজনোচিত উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, বুদ্ধি পরিচায়ক প্রশস্ত ললাট, নাসিকা সুবঙ্কিম, চক্ষু ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটী অস্ত্রাঘাতের দাগ আছে। অস্ত্রাঘাতের দাগ বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বের গুণপনার নিদর্শন হইবে।

দার্জিলিংমেলে যাইলে সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু রাণাঘাটে শ্বশুরালয়ে নামিয়া একবার প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল।

সেইজন্য স্লো ট্রেনে যাইতেছি। রাণাঘাটে এ ট্রেণ ছাড়িয়া দার্জিলিং মেলে চড়িব মনস্থ করিয়াছি।

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনে গাড়ী থামিবামাত্র, দেখিলাম একটী লোক ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট কাঁদিয়া পড়িল। গোলমাল দেখিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। দেখিলাম লোকটি অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছে; তাঁহার ক্রন্দনের ভাবার্থ সংগ্রহ করা কিছু দুষ্কর হইল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝিলাম যে এই লোকটি লাট্দহের জমীদারের নায়েব। কলিকাতা হইতে দশ হাজার টাকার নোট লইয়া একটী জমীদারী কিনিবার জন্য কৃষ্ণনগর অভিমুখে যাইতেছিল। নোটগুলি তাহার গলায় ঝুলান করেসি ব্যাগে ছিল, সেই নোটগুলি সমস্তই চুরি গিয়াছে। সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিলাম :—

"আমি শেয়ালদহ হইতে যখন গাড়ীতে উঠি তখন চাবিওয়ালাকে কিছু দক্ষিণা দিয়া অপর কেহ কামরায় উঠিতে না পারে এজন্য চাবি বন্ধ করাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় একটী ভদ্র লোক, পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া আমার কামরা খুলিয়া তাহাতে উঠিলেন এবং উঠিয়াই পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভদ্র লোকটির সঙ্গে মোট বেশি ছিল না, কেবল একটী মাত্র ছোট চামড়ার ব্যাগ ছিল, সেটি একজন মুটে বহিয়া আনিয়াছিল। বেশ ভূষায় তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হইল। তিনি গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন তিনি যেমন ব্যস্ত হইয়া মুটিয়াকে ব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিয়া দিবেন অমনি তাঁহার ব্যাগ হইতে একটী শিশি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। যখন দমদমা ষ্টেসনে গাড়ী থামিল, তখন তিনি দুই খিলি পান কিনিলেন এবং তাহার এক খিলি সুজনোচিত ব্যবহার অনুসারে আমাকে প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার এই ভদ্র ব্যবহারে অতীব প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কথপোকথনে প্রবৃত্ত হইলাম।

"এরূপ কিছুকাল কথোপকথনের পর ট্রেণ যখন বারাকপুর হইতে

ছাড়িল তখন আমি সেই ভগ্ন শিশিটির মধ্যস্থ পদার্থের গন্ধে বিমোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—

'মহাশয় এ শিশিতে কি ছিল ?'

"তিনি বলিলেন," 'সে কি মহাশয় আপনি কুন্তলীন তৈলের নাম জানেন না ? কুন্তলীনের জন্যই আজকাল এইচ্, বসুর নাম বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এসেন্স দেলখোস যদি আপনি আঘ্রাণ করেন তাহা হইলে আপনি ইহা অপেক্ষাও মোহিত হইবেন।' এই বলিয়া একটা সুন্দর ক্ষুদ্র শিশি পকেট হইতে বাহির করিলেন।"

"আমি অত্যন্ত কৌতূহল পরবশ হইয়া বলিলাম, 'মহাশয়, এইটিই কি এসেন্স দেলখোস।'

'হাঁ মহাশয়' বলিয়া শিশিটি তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি ছিপি খুলিয়া নাকের কাছে ধরিলে প্রথম একটা মিষ্ট গন্ধ পাইলাম, কিন্তু সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আসিল, হাত হইতে শিশিটি পড়িয়া যাইতে ছিল তিনি ধরিলেন। তাহার পর কি হইল কিছুই বলিতে পারি না। কাঁচড়াপাড়ার নিকট আসিয়া যখন আমার চৈতন্য হইল তখন আর সে লোকটাকে দেখিতে পাইলাম না, ব্যাগ খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে একখানি নোটও নাই" এই কথা বলিয়া সেলোকটী বালকের মত ভেউ ভেউ করিয়া কান্দিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার নিকট হইতে এইরূপ বিবরণ শুনিয়া সেখানকার দুই এক জন বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার সাব্যস্ত করিলেন যে এই ব্যাটা মনিবের টাকা চুরি করিয়া এ রকম ধূয়া তুলিয়াছে। আমার মত কিন্তু তাঁহাদের সহিত মিলিল না। আমি ইত্যবসরে সেই কামরাটির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিক একটী শিশি ভাঙ্গিয়া এক প্রকার গন্ধ তৈল গাড়ীর মেজেয় ঢালিয়া পড়িয়াছে। বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম একটী তৈলাক্ত নূতন রবারের জুতার ছাপ গাড়ীর অপর দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার পর ফুটবোর্ডের উপরও

ডাকাতি হইয়া থাকে। কর্ত্তা বাবুর আড়তে সেই চোরাই মাল জমা করিয়া লওয়া ও তাহার বিলি বন্দবস্ত করা বাবুর একটি বিশেষ কার্য্য তাহা বুঝিতে পারিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাবুর বাটীতে একটী কাঠের লেটার বাক্স ছিল। হরকরা সেই লেটার বাক্সে চিঠি রাখিয়া যাইত। বাবু পরে খুলিয়া পড়িতেন। সেই বাক্স হইতে চিঠি চুরি করিয়া পড়া আমার প্রধান কার্য্য হইল।

ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীদিগের চিঠি খুলিয়া পড়িতে বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। শীল করা চিঠিগুলি, মদে রুটি ভিজাইয়া মোহরের ছাপার প্রতিলিপি তুলিয়া রাখিয়া, খুলিয়া পড়িয়া আবার পূর্ব্বের মত শীল করিয়া দেওয়া যায়। আমি তাহা অপেক্ষাও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। চিঠির খামের একধারে একচুল কাগজ কাটিয়া চিঠিখানি বাহির করিয়া লইতাম। তাহার পর শিরিশ দিয়া এমন জুড়িয়া দিতাম যে কাহারও সাধ্য নাই ধরিতে পারে।

যত গুলি চিঠি পড়িয়াছিলাম তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই পাই নাই। চার দিনের দিন একখানি চিঠি পড়িয়া মন কিছু সন্দেহ যুক্ত হইল। চিঠি খানি এই ঃ—

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন মিদং

চৌধূরী মহাশয় আপনকার কথামত <u>চারি</u> পাঁচ দিন বিলম্ব করিয়া <u>রাজা</u> বাবুর বাগানে যাই। দেখিলাম <u>বাগান</u> ঘাস এবং আগাছায় ও <u>নোটের</u> শাকে ভরিয়া আছে; আর <u>লেটার</u> খানি বাবুকে দিয়াছি এখানকার <u>নম্বর</u> পঞ্চান্ন। পুকুরের অবস্থা ভাল <u>নাই</u>। আপনি নিয়ম মত চারি <u>পাঁচ</u> দিন বাদে এক এক <u>খানি</u> পত্র অবশ্য অবশ্য করিয়া <u>পাঠাইবেন</u>। যে সকল ইট ভাঙ্গিতে <u>বাকি</u> আছে সে গুলি সমস্ত <u>কলে</u> লইয়া গিয়াছে। এবং কতক <u>ভাঙ্গাও</u> হইয়াছে।

নিবেদন ইতি শ্রীকরম চাঁদ সিং

চিঠিখানির ভাবার্থ বিশেষ কিছুই বোঝা যায়না। যাহা হউক "নোটের" "লেটার" "নম্বর" এই সমস্ত কথাগুলি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে এই চিঠির মধ্যে হারাণ নোট সম্বন্ধে কিছু গূঢ় রহস্য আছে এবং ইহা মনে করিয়া আমি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বারম্বার চিঠির লিখিত শব্দগুলির পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। সহসা আমার নিকট চিঠি খানির রহস্যোদ্ঘাটন হইয়া গেল।

তখন আমার বিনা মাহিনার চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলাম এবং ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজাবাগান ডিবিসনের পিয়নের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। নিযুক্ত হইবার পরদিনই আমি যাহা আশা করিতেছিলাম তাহা পাইলাম, অর্থাৎ চুঁচড়া প্রতাপপুর হইতে সাধুচন্দ্র খাঁ চৌধুরী প্রেরিত করমচাঁদ সিংহের নামীয় একখানি রেজেষ্টারী চিঠি আমার হস্তগত হইল।

রেজেষ্টারী চিঠি লইয়া আমি চার নম্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। রেজেষ্টারী চিঠির সংবাদ পাইয়া বাটীর কর্ত্তা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার নিকট হইতে রসিদ খানি লইয়া সই করিয়া আমার হাতে ফেরং দিলেন। আমি দেখিলাম পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রের লেখা ও এই হাতের লেখা ঠিক এক প্রকার। তখন আমার সঙ্কেতে চারি জন পাহারাওয়ালা আসিয়া করমচাঁদকে গ্রেপ্তার করিল।

তার পর সেই রেজেষ্টারী চিঠি খানির উপর ডেডলেটার আপিসের ছাপ দিয়া একজন সহকারীর দ্বারা প্রতাপপুরে সাধুচন্দ্র খাঁ চৌধুরীর ওখানে পাঠাইয়া দিলাম। ডাকওয়ালা গিয়া খবর দিল যে কলিকাতার একখানি রেজেষ্টারী চিঠি ডেড্ লেটার আফিস ঘুরিয়া ফেরত আসিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিদ খানিতে সই করিয়া ফেরত লইলেন। সেই সময় পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল এবং পূর্ব্বোক্ত রেজেষ্টারী চিঠি খোলায় তাহার মধ্য হইতে পাঁচ খানি চোরাই নোট বাহির হইল এবং তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাসী করায় অপহৃত নোটের আরো কয়েক-খানি পাওয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত করমচাঁদই যে সন্ন্যাসী সাজিয়া ক্যাস বাক্স চুরী করিয়াছিল এবং রেলে নায়েবকে দেলখোসের পরিবর্ত্তে ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা হৃতচেতন করিয়া তাহার ব্যাগ হইতে নোটগুলি চুরি করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

* * * * *

পাঠক গণের স্মরণ থাকিতে পারে পূর্ব্বোক্ত চিঠি খানির "নোটের" "লেটার" "নম্বর" এই তিনটী কথা হঠাৎ চোখে পড়িয়া আমার মনে প্রথম সন্দেহের উদয় হয়। সেই সময় বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম যে এই কয়েকটী কথা ঠিক চারিটী চারিটি কথার অন্তরে আছে। এই ইঙ্গিত অনুসারে পত্রের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক পঞ্চম কথা একত্রে পড়িয়া দেখিয়াছিলাম যে কথাগুলি এইরূপ দাঁড়ায় "চারি রাজাবাগান নোটের লেটার নম্বর নাই পাঁচ খানি পাঠাও বাকী কলে ভাঙ্গাও" অতএব পত্র লেখক যে এই কথাগুলি লিখিবার জন্যই এরূপ সুকৌশলে বাক্য বিন্যাস করিয়াছিল, তাহাতে আমার আর সন্দেহ ছিল না।

বাঙ্গালীর পেটে কোন কথা থাকা বোধ হয় বিধাতার নিয়ম নহে। সেই কারণে হারাণো নোটের যে সিরিয়াল নম্বর নাই, একথা কলিকাতা সহর ময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। কাজেই জুয়াচোরদের একথা জানিতে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই।

নায়েব নিস্কৃতি পাইয়া আমার নিকট আসিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে উপদেশ দিলাম যে যদি ও তিনি লাটুদহের জমীদারের নায়েব, কিন্তু তথাপিও রাস্তার প্রত্যেক ভদ্র লোকের সহিত আলাপ করাটা ঠিক হয় নাই।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী
অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস।



নবম পুরস্কার ৫৲

আমার কাহিনী।

ডেপুটীগিরি পরীক্ষা দিয়া ফাল্গুন মাসের একদিন সূর্য্যাস্তের সময় কলিকাতা হইতে বাটী পৌছিলাম। আমার বাটী বর্দ্ধমান জেলা, সুন্দর পল্লিগ্রামে। বাটীতে থাকেন খুল্লতাত মহাশয় ও খুড়িমা। আমি ইহাদের সহিত এক পরিবারভুক্ত। ইহারাই বাটীর কর্ত্তা ও গিন্নি।

আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। ভাই ভগ্নি নাই। খুড়া মহাশয়ও অপুত্রক। বাড়ীর মধ্যে ছেলে—সবে ধন আমি নীলমণি। মা বাপ মরা ছেলে। খুল্লতাত মহাশয় ও খুড়িমা হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু আমার উপর ঢালিয়াছিলেন। তাতে আবার এ আদরের অংশীদার কেহ নাই। আমি যেন আলালের ঘরের দুলাল। যখন যাহা চাই খুল্লতাত মহাশয় সাধ্যমত মনস্কামনা পূর্ণ করিতে ত্রুটী করিতেন না। আমার শৈশবের দৌরাত্ম্যে লোকজন পাড়াপ্রতিবেশী ব্যতিব্যস্ত। আমি যেন দ্বিতীয় কৃষ্ণঠাকুর। ননী চুরি মাখন চুরি, দই চুরি ঘোল চুরি, আম জামের ত কথাই নাই। খুড়া মহাশয়ের নিকট নালিসে কোন প্রতিকার হইত না। কেহ আমার নামে নালিশ করিতে আসিলে তিনি তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া দিতেন। ছেলে বেলার একদিনের গল্প বলি। তাহা হইলে আমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তখন গ্রামের গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠশালে বোধোদয় পড়ি। বৈকালবেলা পাঠশালা বসিয়াছে। পাততাড়ি খুলিয়া ধারাপাত লিখিতেছি ও পাশের সহপাঠীকে চিম্‌টী কাটিবার সুখ তৃপ্তিপূর্ব্বক উপভোগ করিতেছি। গুরুমহাশয় অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় শিথিল হস্তে আরামদায়িনী

হুক্কাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত। এমন সময় আমার ও আমার সহপাঠীর নামে ওপাড়ার হরি চাটুর্য্যে কর্ত্তৃক নালিশ রুজু হইল। ব্যাপার —খিড়কি পুকুরের পাড়ের আমগাছ হইতে আম চুরি। গুরুমহাশয় বিরক্ত হইলেন; দেখিতে দেখিতে তিনি রক্তবর্ণ চক্ষে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। সর্দ্দার পড়োরা পর্য্যন্ত তটস্থ। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভীক। দিক্‌বিজয়ী বীর যেমন শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া গন্তব্য পথে সসৈন্যে সতেজে চলিয়া যায়, আমি তেমনি নির্ভীক হৃদয়ে তেমনি বীরের মত সতেজে পাততাড়ির উপর শরের মোটা কলম চালাইতে লাগিলাম। আমি জানিতাম পণ্ডিত মহাশয় সহস্র দোষেও আমাকে কিছু বলিবেন না। আমাদের বাটী হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের অনেক পাওনা। মাসিক মাহিনা—আমার মাহিনা আবার সকল ছেলের চেয়ে বেশী। আমাদের বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বন, পূজা পার্ব্বনে কাপড় চোপড় গুরুমহাশয়ের অবশ্যম্ভাবী পাওনা। আমাদের বাড়ী গুরুমহাশয়ের প্রায়ই নিমন্ত্রণ; হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইবার দায় হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের সেই সব দিন পরিত্রাণ। এসব বাদে, আমার বুদ্ধির গুণে ও হস্তের কসরতে প্রায়ই ভাল তামাক আমাদের বাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইত। এহেন আমি, আমাকে কি গুরুমহাশয় কিছু বলিতে পারেন? তায় আবার আমি আদুরে ছেলে। আমায় কিছু বলিলে খুড়া মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন সেটা পণ্ডিত মহাশয়ের বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং আমি বেশ বুঝিতে পারি ও বরাবর দেখিয়াছি পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমার সাতখুন মাপ। নালিশ শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "রাজু, বলত, বাবা কি হয়েছিল? সত্যি বল বাবা, জানত আমি মিছে ব'ল্লে হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিব।" পণ্ডিত মহাশয়ের স্বর স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিক নয়, বরং একটু আদরের। আমি বল্লাম "না, পণ্ডিত মহাশয় আমি যাই নাই, এই শ্যামা আমায় নিয়ে গিয়েছিল।" আমার সহপাঠী যাহার গাত্রের উপর এতক্ষণ নখরের ধার পরীক্ষা করিতেছিলাম তাহারই নাম শ্যামসুন্দর ওরফে শ্যামা। বলা বাহুল্য দুই জনই দুপুর

রৌদ্রে আম্র সেবন সুখ উপভোগ করিতে গিয়াছিলাম; শ্যামা আমাকে লইয়া যায় নাই, আমিই বরং শ্যামাকে লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমি যেই বলিলাম শ্যামা আমাকে লইয়া গিয়াছিল, বাস্ আমি বেকসুর খালাষ। পণ্ডিত মহাশয় তর্জ্জন করিলেন "বটেরে শ্যামা, রেজোর দোষ কি, তুই ত যত নাটের গুরু।" শ্যামের কোন সাফাই খাটিল না। তাহার পিঠে ঘা কয়েক সপাসপ্ হইয়া গেল।

পাঠশাল ছুটী হইলে শ্যামা ও আমি যক্তি করিলাম হরি চাটুয্যেকে জব্দ করিতে হইবে। রাবণ রাজার রাজনীতি "শুভস্য শীঘ্রং"। আমাদেরও যেই কথা সেই কাজ। পরদিন রামা ছুতারের করাত হারাইল। তিন দিনের অনবরত চেষ্টায় ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষটী ভূমিস্যাৎ। এমনি বুদ্ধির জোর ও ভগবানের কৌশল, যে কেহই ধরিতে পারিল না। কিন্তু সকলেই বুঝিল। সেই অবধি কেহ কখন আমার নামে গুরু মহাশয়ের নিকট নালিশ করিতে আসে নাই।

এমনি করিয়া আমার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। চন্দ্রের কলার ন্যায় দিনে দিনে আমার বয়স বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়রূপ ভবসমুদ্রে ক্রমে ক্রমে পাড়ি দিতে লাগিলাম। প্রবেশিকা, এলে, বিএ, ল উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটীগিরি পরীক্ষা দিলাম। বয়স তেইশ বৎসর। এত বয়স হইল, এত পাশ করিলাম, কিন্তু একটি দোষ আমার গেল না, প্রবৃত্তি দমন করিতে আমি কখন শিখি নাই। শৈশব হইতে যখন যাহা চাহিয়াছি তখনই তাহা পাইয়াছি। খুড়া ও খুড়িমা প্রাণপণে অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। অপূর্ণ অভিলাষের ব্যথা কখন আমায় ভোগ করিতে হয় নাই। সেই স্বভাব প্রথমেই দৃঢ় হইল। আমার যাহা ইচ্ছা— বুঝিয়াই হউক আর খেয়ালবশেই হউক, ভাল হউক মন্দ হউক—আমার যাহা ইচ্ছা আমি তাহা করিবই। কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন আমি গ্রাহ্য করিব না। বাধা পাইলে বরং আমার আগ্রহ অধিকতর হয়। এই খানেই আমার দোষ।

তা দোষ হয় হউক। চাঁদেও কলঙ্ক আছে, মৃণালেও কণ্টক।

ডেপুটীগিরি পরীক্ষা দিয়া বাটি আসিলাম। লোক মুখে আমার এখন প্রশংসা ধরে না। পাড়াগেঁয়ে লোক, সবাই মনে করে আমি একটা বিদ্যার জাহাজ। যেখানে পাচ জন বসিয়াছে সেইখানেই আমার কথা ও আমার প্রশংসা। কেহ বলিত, আমি একটা ক্ষণজন্মা ছেলে, এমন ছেলে আর হয় না। শৈশবে, বাল্যে, আমি কখন কাহার নিকট কোন বিষয়ে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছিলাম, তাহারই আলোচনা হইত। মেয়ে মহলেও আমার পশার ভারি। এই সব শুনিয়া খুড়িমা আহ্লাদে আটখানা।

ক্রমে অনেক লোক আমার শ্বশুর পদ লাভ করিবার জন্য খুল্লতাত মহাশয়ের উমেদারী করিতে লাগিলেন। শেষে অনেক দেখিয়া শুনিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রামে একটি পাত্রী মনোনীত হইল।

যথা সময়ে মাথায় টোপর ও হাতে সুতা বাধিয়া লোকজন বাদ্য কোলাহল সহিত ভাবী শ্বশুর গৃহে আমি উপস্থিত। বিবাহ হইল। কিন্তু দেনা পাওনা লইয়া শ্বশুরের সহিত খুড়া মহাশয়ের কি একটা গোলযোগ হইয়াছিল। কি গোলযোগ হইয়াছিল, আমি জানি নাই; জানিবার অবকাশও ছিল না। আমি তখন ভাবে বিভোর। আমার কি তখন বাহ্যজ্ঞান আছে? আধ আলো, আধ ছায়া গোছ একটি অস্পষ্ট সলজ্জ সুন্দর মুখের (বিবাহিত পাঠক ক্ষমা করিবেন, শুভ দৃষ্টির আমার এই অভিজ্ঞতা) অপূর্ব্ব মাধুরী আমার তখন হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল। পরে শুনিলাম, শ্বশুর মহাশয় খুল্লতাত মহাশয়কে দেনা লইয়া কিঞ্চিৎ রূঢ় কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। আমি কথাটায় এমন বিশেষ কিছু মনোযোগ করিলাম না।

বিবাহের পর ফুলশয্যা। সেই রাত্রি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা এক মুখে বর্ণনা সম্ভবে না। যদি মহাদেবের মত পঞ্চমুখ থাকিত, তাহা হইলে বর্ণনা করিতে পারিতাম, যদি ব্যাসদেবের ন্যায় বর্ণনা শক্তি থাকিত, যদি গণেশের ন্যায় লেখনীর পটুতা থাকিত, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে পারিতাম। বাস্তবিক এ বর্ণনা আমার অসাধ্য। ভাবিলাম বুঝি বা কোন

দেবী আমাকে ছলনা করিবার জন্য এ ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন। (পাঠিকাগণ হাসিবেন না)।

অষ্টাহকাল আমাদের বাটীতে থাকিয়া আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে চলিল ও সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়টা খালি করিয়া গেল। কিছু ভাল লাগে না। খাওয়া দাওয়া, আমোদ প্রমোদ কিছুতেই সুখ নাই। আমার যেন "জনম অবধি, বিরহে দগধি, এ জীবন হ'য়ে গেল ছাই"। আমার যখন এই অবস্থা তখন একদিন খবর আসিল আমি ডেপুটী পরীক্ষায় ফেল হইয়াছি। মনটা আরও বেশী খারাপ হইয়া গেল।

ক্রমে মাস চারি গত হইল। মনে শান্তি নাই। ইতিমধ্যে শ্বশুর মহাশয় আমাকে লইয়া যাইবার জন্য খুড়া মহাশয়ের নিকট বার দুই চিঠি লিখিয়াছিলেন। খুড়া মহাশয় দুই বারই আপত্তি করিয়াছিলেন। আমাকেও বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন শ্বশুর বাটী না যাই। বিবাহের সময়ের দেনা পাওনা উপলক্ষে শ্বশুর মহাশয়ের সেই রূঢ় ব্যবহার খুড়া মহাশয়ের তখনও মনে আছে।

কিন্তু আর আমি নিষেধ আজ্ঞা মানিতে পারিতেছি না। মনের অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিবাহের পর আট দিনের পরিচয়ে আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী। মনে হইল, তাহার সহবাসে হয় ত শান্তি পাইব। ঠিক করিলাম শ্বশুরবাড়ী যাইব।

কিন্তু যাই কি করিয়া। বাড়ী হইতে যাওয়া ত অসম্ভব। খুল্লতাত মহাশয় ত কিছুতেই যাইতে দিবেন না। আর এহেন স্নেহময় খুল্লতাত মহাশয়ের প্রকাশ্য বিদ্রোহাচরণ করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতে কেন বৈকুণ্ঠধাম যাইতেও প্রবৃত্তি নাই। অথচ শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইবে। মনের বেগ দমন অসাধ্য।

এক মতলব ঠিক করিলাম। বাটী হইতে এক ছুতা করিয়া কলিকাতা আসিলাম। সেখান হইতে একবারে শ্বশুরবাড়ী। মনে দ্বিধা নাই।

অবশ্য এখন আমার অজ্ঞাতবাস। বাহিরে প্রকাশ এখন আমি

কলিকাতায়। বাটী হইতে চিঠি পত্র আসিতে লাগিল কলিকাতার ঠিকানায়। কলিকাতা হইতে আমার হাতের লেখা উত্তর পর্য্যন্ত যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। কেমন করিয়া শুনিবেন? বন্ধু বান্ধবেরা চিঠির ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া চিঠিগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। আমি আবার উত্তরগুলি তাঁহাদের নামে কলিকাতায় পাঠাইতাম। তাঁহারা নূতন খামে সেই উত্তরগুলি ভরিয়া আমার খুড়ার নামে পাঠাইতেন। বুদ্ধির বাহাদুরি নাই কি?

শ্বশুর বাড়ী আসিয়া মনে কতকটা শান্তি পাইলাম। দীর্ঘ বিরহের পর অপূর্ব্ব মিলন সুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম। যেন উত্তপ্ত ধরণী বারিধারা বর্ষণে শীতল হইল। দিনগুলা আমোদ আহ্লাদে কাটিতে লাগিল। তাস পাশা দাবা, দাবা পাশা তাস। দিনের বেলা গল্প গুজব। সঙ্গী অনেক গল্পও নানা প্রকার। খোদ মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে রামা কামার, বিদ্যাসাগর হইতে একাদশী বাড়ুয্যে, অহল্যাবাই ও মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল হইতে স্বর্ণবাই ও তেলী বৌ পর্য্যন্ত আমাদের গল্পের বিষয়ীভূত। আমাদের খেলার আড্ডা ঠিক যেন অনুসন্ধানের "পঞ্চভৌতিক" সভা। একদিন সৌখিন বাবু সম্বন্ধে কথা উঠিল। পরিদৃশ্যমান সৌখিন বাবুর দৃষ্টান্ত হইতে ক্রমে ক্রমে মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে আদর্শ সৌখিন বাবুর কাল্পনিক নমুনার দিকে সকলের মন ধাবিত হইল। সকলেই আপন আদর্শকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে মনোমত করিয়া সাজাইলেন। পায়ে কার্পে-টের জুতা হইতে মস্তকে রেশমী ছাতা পর্য্যন্ত সকলই হইল। বাদসাহী আতর গোলাপ জল হইতে সাহেবী অডিকলম লাভেণ্ডার পর্য্যন্ত আদর্শ সৌখিন বাবুর গোঁফে ও মাথায় চড়িল। দশাঙ্গুলে হীরকাঙ্গুরীয়। সকলের সাজান হইলে পর আমি বলিলাম "ভাই তোমাদের সৌখিন বাবু 'সৌখিন' হয় নাই। তোমাদের সৌখিন বাবুর 'দেলখোস' নাই। ইহাতে একজন বলিল "দেলখোস' আবার এসেন্স, ওসব কলিকাতার জুয়াচুরি"। আমার পোর্টমেণ্টে দেলখোস ছিল। আমি কিছু না বলিয়া পোর্টমেণ্ট খুলিয়া দেলখোসের শিশিটী আনিলাম। যে ব্যক্তি

দেলখোস জুয়াচুরি বলিয়াছিল তাহার জামায় কিঞ্চিৎ ঢালিয়া দিলাম। সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইল। সকলেই বলিল ইহার গন্ধ খুব মনোরম, সকল রকম এসেন্স অপেক্ষা বেশী। তখন সেই ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল "ইহার গন্ধ বেশী হইতে পারে কিন্তু ক্ষণস্থায়ী"। আমি বলিলাম তোমার জামার গন্ধ যদি তিন দিন না থাকে তাহা হইলে পাঁচ টাকা দিব। সেও তদ্রূপ বাজি রাখিল। সে সমস্ত দিন জামাটী গায়ে দিয়া রাখিল। তাহার পর দিন জামাটী বাক্সে পুরিয়া ডবল চাবি দেওয়া হইল। তিন দিন পরেও দেলখোসের গন্ধ স্পষ্ট অনুভূত হইল। সুতরাং সে বাজি হারিল। আমি এই টাকার সঙ্গে কিছু দিয়া বন্ধু বান্ধবদিগকে ভোজ দিলাম।

দিনের বেলা এই প্রকারে কাটে। রাত্রে রহস্য, প্রেমালাপ। বিবাহিত পাঠককে তাহার আর নূতন পরিচয় কি দিব?

দিন কয়েক শ্বশুর বাড়ীতে কাটাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। তথা হইতে বাড়ী। বাড়ী আসিলাম বটে, কিন্তু আসিয়াই দেখি সব গোল। আমার অজ্ঞাতবাস সব প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে কিনা! আমাদের স্বগ্রামস্থ একটা লোক কলিকাতা আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কলিকাতাস্থ বাসায় আসিয়া আমার সম্বন্ধে সমস্তই শুনিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে খুল্লতাত মহাশয় শুনিয়াছেন। খুল্লতাত মহাশয় আমাকে স্পষ্ট কিছু বলিলেন না। আমি কিন্তু নবমীর পাটার ন্যায় কাঁপিতেছি। বুঝিলাম আমার এই ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। কিন্তু তিনি আমার উপর রাগ করিয়া থাকিবেন কত কাল? দিন কয়েক পরেই আমার উপর বিরক্তিভাব চলিয়া গিয়া সেই রাগ ভীষণতর হইয়া শ্বশুর মহাশয়ের উপর পড়িল।

এই সময় হইতে আমার ম্যালেরিয়া হইল। অনেক দিন ভুগিলাম। নানা ঔষধ ডাক্তারি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী চলিতে লাগিল। শেষ টোট্‌কা টাট্‌কি ঝাড় ফুঁ পর্য্যন্ত; কিন্তু কিছুতেই ভাল হইল না। তখন একটা কথা উঠিল বৌয়ের পয় ভাল নয়, বৌয়ের দোষে ছেলের

অসুখ। কথাটা প্রথমে মেয়ে মহল হইতে উঠিল। খুড়িমা শুনিলেন, প্রথম প্রথম কথাটায় বড় কান দিতেন না। কিন্তু নানা লোকে নানা ভাবে সর্ব্বদা এই কথা উক্তি করার দরুণ ও নানা প্রকার মেয়েলি যুক্তি, তর্ক, দৃষ্টান্তের অবতারণা করাতে তাঁহারও এই কথা মনে উদয় হইল। রোগ উপশম না হওয়াতে এই বিশ্বাস ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি আমা গত প্রাণ, তিনি কি আর থাকিতে পারেন? তিনি খুড়া মহাশয়কে বলিয়া কহিয়া আমার শুভাকাঙ্খায় (খুড়া মহাশয়েরও শ্বশুরের উপর রাগ আছে) পাত্রী অনুসন্ধান করাইতে লাগিলেন।

আমার বিপদ হইল। পুনরায় বিবাহ করিতে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। আমার স্ত্রীর সহিত আমার কোন মনোমালিন্য নাই। আমার বিশ্বাস—আমার স্ত্রীর মত স্ত্রী নাই। আমি ভাবিতেছি ভগবান কি কোন উপায় করিবেন না। শেষে কি নিতান্তই বিবাহের দিন গুপ্তভাবে গৃহ হইতে পলায়ন করিতে হইবে? আমি কিন্তু আমার মনোভাব কাহাকেও প্রকাশ করিলাম না।

ব্যাপার যখন এই রকম দাঁড়াইয়াছে, তখন একদিন দেখি একটী শিবিকা আসিয়া আমাদের বাটীর দ্বারে লাগিল। শিবিকা হইতে বাহির হইল আমার স্ত্রী।

লোক পরম্পরায় আমার শ্বশুর যখন শুনিলেন যে আমার পুনরায় বিবাহের জন্য পাত্রী অনুসন্ধান চলিতেছে, তখন তিনি আকাশ হইতে পড়িলেন। শেষ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিরাভরণা, এক বস্ত্র পরিহিতা তাঁহার কন্যা পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে কেবল একজন দাসী। এই আমার স্ত্রীর দ্বিরাগমন।

খুড়িমাতাঠাকুরাণী আমার স্ত্রীকে মুখে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে যত্ন যে আন্তরিক নয় তাহা বুঝা যায়। আমার স্ত্রী প্রাণপনে তাঁহার প্রিয়পাত্রী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রাণপনে তাঁহার সেবা, গৃহকর্ম্মে সহায়তা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার প্রতি খুড়িমার মনও কিছু নরম হইল।

দিন কয়েক পরে আমার শ্বশুর মহাশয় দ্বিরাগমনের সমস্ত সাজ সরঞ্জাম পাঠাইলেন। প্রত্যেক জিনিষই দামী। খুড়া মহাশয় দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাসিলেন।

আমার স্ত্রী আমাদের বাটীতে আসার পর বিবাহের কথা আর তেমন প্রকাশ্যভাবে আলোচিত হইত না। যাহা হইত তাহা গোপনে। শেষে এক অদ্ভুত ঘটনা দ্বারা আমার এই ভয়ঙ্কর বিরহান্ত নাটকের অভিনয় হইতে মুক্তি পাইলাম।

আমার খুড়িমা একদিকে বেশ মানুষ যেন মাটীর মানুষ। কিন্তু তাঁহার একটি দোষ ছিল, নিজের নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যে তাঁহার নিন্দা করিত তিনি তাহার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেন না। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে, কি কারণে জানি না, তাঁহার মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছিল। অনেক ঔষধপত্র তিনি মাথায় লাগাইলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে চুল এখন খাট হইয়া গিয়াছে ও অনেক উঠিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকের ইহাতে অবশ্য খারাপ দেখায়। প্রতিবেশী কামিনীরা তাঁহার স্বল্পকেশের কথা লইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসাহাসি করিত। ইহা তাঁহার সহ্য হইত না। এইজন্য তিনি তাহাদের উপর চটিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেন না।

আমার স্ত্রী একদিন বলিল "মা (সে মা বলিত), আমার কাছে এক রকম তেল আছে, তাতে চুল উঠা বন্ধ হয়, নূতন চুল গজায় আর মাথা ঠাণ্ডা হয়। তুমি ত চুলের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছ, আমি একবার দেখি। এ তেল নূতন বেরিয়েচে।" এই বলিয়া সে খুড়িমার সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কুন্তলীনের শিশি খুলিয়া তাঁহার মাথায় বেশ করিয়া মাখাইল। সেই দিন হইতে রোজ অবসর পাইলেই সে খুড়িমার মাথায় কুন্তলীন মাখায়। ক্রমে দুই শিশি মাখান হইলে পর (ধন্য আবিষ্কারক) তাঁহার মাথার চুল ঘন হইতে ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আরও দুই শিশি মাখান হইল। তখন চুল প্রায় পূর্ব্ববৎ হইল। সকলেই কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

এই ঘটনায় খুড়িমা আমার স্ত্রীর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। যাহা কেহ করিতে পারে নাই, তাহা এই চারি শিশি কুন্তলীন সম্পন্ন করিল। সেই দিন হইতে আমার পুনর্ব্বার বিবাহের প্রসঙ্গ বন্ধ হইল। কেহ ঐ কথা উত্থাপন করিলে খুড়িমা বলিতেন "বালাই, বউমা আমার লক্ষী, আমি কেন শুধু শুধু বৌমাকে সতীনের জ্বালায় জ্বালাব।" সেই দিন হইতে আমার স্ত্রীও সেই কাচের শূন্য চারিটী শিশি ভগবানের অপার দয়ার নিদর্শন বলিয়া পূজা করে।

এদিকে আমার অসুখও ভাল হইল। এখন আমার স্ত্রী অপয়া, কুপয়া নাই। এখন তাঁহাকে পায় কে? তিনি ঘরের লক্ষ্মী। খুড়িমা কথায় কথায় বলেন "বউমা আমার ঘরের লক্ষী"। যখন যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তখন এমনিই হয়। ইনি এখন উড়ে এসে যুড়ে বসে আমার পাওনায় ভাগ বসাইয়াছেন। জন্মাবধি আমি যে স্নেহ দখল করিয়া আসিতেছি, তিনি আমার সেই মৌরসী স্বত্ত হইতেও অনেকটা আমাকে বেদখল করিয়াছেন।

আমাদের ঘরকন্নায় আর কোন গোলযোগ নাই। বেশ সুখে আছি। যাহা ঝগড়া কেবল আমাদের দুজনে, তাহাও আবার সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়া যায়।

শ্রীসতিশচন্দ্র ঘোষ।



দশম পুরস্কার ৫৲

প্রতিশোধ।

গত বৎসর যখন আমার বিবাহের কথা হয় তখন আমি ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিয়াছিলাম। বিবাহের পূর্ব্বেই আমি আমার ভাবী পত্নীর রূপ গুণের বিষয় কতকটা শুনিতে পাইলাম। যাহারা বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা আসিয়া বলিলেন যে "মেয়েটি খুব সুন্দরী না হইলেও মন্দ নহে এবং দেখিলে ধীর প্রকৃতি ও শান্ত স্বভাবা বলিয়া বোধ হয়।" "মেয়েটি তত সুন্দরী নয়" এই কথা শুনিয়া পিতাঠাকুর মহাশয় বিবাহে একটু আপত্তি করিলেন; কিন্তু ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্কা অরক্ষণীয়া কন্যার ভারে প্রপীড়িত একজন ভদ্রলোকের অনুরোধ ও তৎ প্রদত্ত অর্থ উপঢৌকনাদির লোভ এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। শুভ কার্য্যের দিন স্থির হইল।

আরও ভাল করিয়া জানিবার জন্য মাতাঠাকুরাণী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে গোপনে আমার শ্বশুরদের বাড়ী পাঠাইলেন। তাহার মুখেও সেইরূপ শোনা গেল; অধিকন্তু সে বলিল "যে মেয়েটির মা নাই, সেইজন্য একটু অভিমানিনী, কিন্তু কায কর্ম্মে খুব চালাক।" মাতাঠাকুরাণী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন যে "গৃহস্থ ঘরের মেয়ে কায কর্ম্ম করতে পাল্লেই হ'ল; দেখ্‌তে চলনসই হওয়াই ভাল, খাস্ পরিটীর মত হওয়া কিছুই নয়; আর অভিমানিনী, হ'লইবা, আমার ঘরে একলা শাশুড়ীর বৌ হবে কেউ তাকে কিছু বল্‌বেও না, তার অভিমান কর্‌বার কোন কারণও থাক্‌বে না।"

পিতা অর্থ ও অনুরোধের বশীভূত হইয়া, মাতা পুত্রবধুর রূপ গুণের কথা শুনিয়া বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন; তবে আর

বিবাহের অপেক্ষা কি? এক অপেক্ষা আমার নিজের মতের,—কিন্তু আমার মত কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন না।

এই স্থলে বলিয়া রাখি যে প্রথমে বিবাহের নামে মনটা অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে পত্নীর রূপ গুণের কথা শুনিয়া একটু দমিয়া গেল। আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর হইতে নানাবিধ নাটক উপন্যাস পাঠ করিয়া হৃদয় মধ্যে যে একটি কল্পিত রমণীমূর্ত্তি স্ত্রীরূপে স্থাপন করিয়াছিলাম তাহার সহিত আমার এই ভাবী প্রণয়িণীর কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হইল না। আমি ইংরাজী শিক্ষিত নব্য যুবক, আমার প্রণয়িণী রূপে কবিকল্পিতা কাব্য উপন্যাসের নায়িকাগণের ন্যায় রূপবতী রমণীর আদর্শ হওয়া আবশ্যক; বিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিভূষিতা না হইলেও পত্র লিখিবার সময় বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস ও রবি বাবুর কবিতা হইতে quotation করিতে পারা উচিত; প্রেমে জুলিয়েটের ন্যায় আত্মহারা না হইলেও নেহাৎ ভীরু স্বভাবা, লজ্জাশীলা, দু হাত ঘোমটাটানা পাড়াগেঁয়ে কনেবৌ হইলে চলিবে না। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে রূপের কথা যাহা শুনিলাম তাহাকে ত আমি রূপ বলিয়াই মনে করি না। আর গুণের মধ্যে শুনিলাম "যে কায কর্ম্মে খুব চালাক" তাহাতে আমার বিশেষ লাভ কি? গৃহস্থলীর কার্য্যে পটু হউক আর নাই হউক তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে শুনিলাম যে "বড় অভিমানিনী", অন্যের নিকট তাহা দোষের মধ্যে পরিগণিত হইলেও আমি দেখিলাম যে সেইটাই কেবল একমাত্র গুণ; কেননা কবিদের মতে অভিমান না হইলে দাম্পত্য প্রেমে সুখ হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া অবশেষে বিবাহ কাল সমাগত হইল। আমারও চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম আমার পূর্ব্ব অনুমান সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে; দেখিলাম যে আমি পত্নীরূপে যে বালিকা রত্নটী লাভ করিয়াছি সেটী আমার কল্পনা রচিত আদর্শ রমণী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

সম্প্রদানার্থ শ্বশুর মহাশয় যখন তাঁহার কন্যার হস্ত আমার হস্তে স্থাপন করিলেন তখন আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত হইল; আমি কেবল যন্ত্রপরিচালিত পুত্তলিকাবৎ পুরোহিত-মুখ-নিঃসৃত মন্ত্রের পুনরোচ্চারণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই পট্টবসনাবৃতা বালিকাটী আমার নয়ন ও মন সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইল; আমি প্রাণ ভরিয়া সেই রূপরাশি দেখিয়া লইলাম। বুঝিলাম যে পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছি তাহা সমস্তই ভুল; যাহারা বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা হয় মিথ্যাবাদী কিম্বা বিকৃতি মস্তিষ্ক ও স্থূলদৃষ্টি। এখন যাহা দেখিলাম তাহাতে পূর্ব্ব সন্দেহ সমস্ত দূরীভূত হইল; দেখিলাম সে রূপের সীমা নাই, সে রূপের তুলনা নাই। বোধ হয় যেন বিধাতা আদর্শরূপে প্রথমে সেই বালিকাটীর সৃষ্টি করিয়া তাহারই অনুকরণে পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দর পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। বুঝিলাম সে রূপ মর জগতের নহে, তাহা স্বর্গীয় সৌরভে পরিপূর্ণ। সে রূপের তুলনা না পাইয়া মনে করিলাম :—

"তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার সমুদ্রে পূর্ণ মাত্রায় জোয়ার আসিয়াছে। বিবাহের পর দেনা পাওনা সম্বন্ধে শ্বশুরের সহিত পিতার একটু মনোমালিন্য হওয়ায় ঠিক সময়ে আমার স্ত্রীর বাপের বাটী যাওয়া হইল না; অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক দিন আমাদের বাটীতে থাকিতে হইল। নব দম্পতীর প্রণয়ের সূত্রপাতটী আমাদের বাটীতেই ঘটিয়া গেল। প্রথম আলাপেই কিছু নূতনত্বের পরিচয় পাইলাম। নব পরিণীতা পত্নীকে বশীভূত করিতে হইলে যে সকল অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন আমা[illegible] সে সকল কিছুই প্রয়োগ করিতে হইল না। আমার স্ত্রী প্রথম হইতে [illegible] পরিচিতার ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিল। আপনাদের মধ্যে অনেকে এবিষয়ে তাহাকে নির্লজ্জা মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহাতে লজ্জাশীলতার কোন অভাব দেখিতে পাইলাম না; তবে দুঃখের মধ্যে এই যে আমি জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" প্রভৃতি

কয়েকটী শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করিয়া অনেক দিন হইতে মুখস্থ করিতে-ছিলাম, সেইগুলির কোন সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। প্রথম আলাপেই বুঝিতে পারিলাম যে বিধাতা সেই বালিকাটীকে রূপের উপযোগ্য গুণও দিয়াছেন। তাহার সেই উজ্জ্বল নয়নে চাঞ্চল্য আছে কিন্তু কটাক্ষ নাই, বাক্যে মধুর রসিকতা আছে কিন্তু অশ্লীলতা নাই, হাসিতে সরলতা আছে কিন্তু লজ্জাহীনতা নাই, প্রেমপূর্ণ নির্ম্মল হৃদয়ে অভিমান আছে কিন্তু সেই অভিমানে গরল নাই। সেই বালিকা যখন তাহার সেই পুষ্পরাশি তুল্য কোমল বক্ষঃস্থল আমার এই শুষ্ক বক্ষের উপর, তাহার জ্যোৎস্না তুল্য অধর দুখানি আমার এই পরুষ ওষ্ঠের উপর স্থাপিত করিয়া আমার দিকে অনিমেষ লোচনে তাকাইয়া থাকিত, যখন তাহার সেই বুকভরা প্রেম, মুখভরা ভালবাসা, নয়নভরা ভক্তি আমার উপর অজস্রধারে বর্ষণ করিত তখন মনে করিতাম এই পৃথিবীতেই স্বর্গ এবং সেই স্বর্গসুখে আমিই কেবল একমাত্র অধিকারী।

এইরূপে একটী প্রণয় স্রোতে আমরা আমাদের দুই জনের দুইটী ক্ষুদ্র প্রাণ ভাসাইয়া দিলাম; মনে করিলাম এ স্রোতের গতিরোধ নাই, এ নদীর তীর নাই, এ প্রণয়ের অন্ত নাই। কিন্তু দেখিলাম, তাহা নহে; দিনের পরে রাত্রি আছে, শুক্ল পক্ষের পর কৃষ্ণ পক্ষ আছে, সুখের পর দুঃখ আছে, মিলনের পর বিচ্ছেদ আছে আমাদেরও প্রণ-য়ের সীমা আছে।

দেখিতে দেখিতে কুড়িটি দিন কুড়িটি মুহূর্ত্তের মত আমার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পিতার সহিত গোলযোগ মিটিয়া যাওয়ায় শ্বশুর আসিয়া তাঁহার কন্যাকে আপনাদের বাটী লইয়া গেলেন। আমার সুখ-সমুদ্রের জোয়ার বেলা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু এই বারে ভাটা আসিল। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে সংবাদ আসিল যে আমি পরীক্ষায় ফেল হইয়াছি। পরীক্ষায় ফেল হওয়া যে কিরূপ কষ্টের কারণ তাঁহা আমার ন্যায় ভুক্ত-

ভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। একে প্রিয়বিরহ, তাহার উপর কার্য্য সিদ্ধির বিঘ্ন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পিতার তীব্র ভৎর্সনা, মাতার মর্ম্মস্পর্শী আক্ষেপবাণী, বন্ধু বান্ধবের ঘৃণাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত, এই সকলে আমার হৃদয়কে জর্জ্জরীভূত করিল। সংসার মরুভূমি তুল্য বোধ হইল।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে আমার শ্বশুর আমাকে লইয়া যাইবার জন্য পিতার নিকট লোক পাঠাইলেন। আমার এইরূপ মানসিক অবস্থা দেখিয়া তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। আমারও আশা হইল যে সংসার মরুর একমাত্র আশ্রয় তরুতলে দাঁড়াইয়া এই উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিব।

কিন্তু মানুষ যেখানেই যা'ক সুখ দুঃখ ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগমন করে। আমি শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়াও হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না বরং অশান্তি দ্বিগুনতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মনে করিয়াছিলাম যে প্রিয়তমার মধুর সম্ভাষণে হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে; কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলাম যে সব বিপরীত। শয়নকালে যখন স্ত্রীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখনই দেখিলাম যে তাহার সেই সরল সুন্দর মুখখানি নিদারুণ অভিমানের ছায়া দ্বারা আবৃত; বুঝিলাম আমার পরীক্ষায় অকৃত কার্য্যতাই তাহার কারণ। যাহা হউক আমি কষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া তাহার সহিত নানাবিধ কৌতুকে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু আমার বাছা বাছা সমস্ত অস্ত্রগুলিই তাহার দুর্জ্জয় অভিমানরূপ বর্ম্মে ঠেকিয়া ব্যর্থ হইল। সে একটী ছোট খাট দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি পশ্চান্মুখ হইয়া শয়ন করিল। যে নিঃশ্বাসে একদিন স্বর্গীয় সৌরভের আঘ্রাণ পাইয়াছিলাম অদ্য সেই নিঃশ্বাসে তীব্র ফুৎকারের ন্যায় আমার হৃদয়ের অগ্নি দ্বিগুণ বেগে জ্বালাইয়া দিল। শয্যা আমার পক্ষে কণ্টকময় বোধ হইল। বাহিরে উঠিয়া আসিলাম, ছাদের উপর বসিয়া চিন্তাস্রোতে দেহ ঢালিয়া দিলাম। ভাবিলাম এই কি সংসার। এত প্রেম, এত ভালবাসা কি সমস্তই একটা সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল! পিতার যত্ন,

মাতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম এ সকল কি কেবল কথার কথা মাত্র! সংসার কি কেবল স্বার্থের ক্রীড়াক্ষেত্র! মনে করিলাম এই মুহূর্ত্তেই পিতামাতা, স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কোন অপরিচিত অজানা দূরদেশে চলিয়া যাইব, যদি কখন মানুষ হইতে পারি তবেই গৃহে ফিরিব; নতুবা এই পর্য্যন্ত। মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিলাম। কিন্তু বিদায়কালে আর একবার "সেই মুখখানি" দেখিতে ইচ্ছা হইল; গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রদীপের আলোকে সেই নিদ্রিত মুখ খানি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম নয়নের কোণে তখনও বিষাদের কালিমা, গণ্ডদেশে তখনও অভিমানের রক্তিমা। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলাম, কিন্তু দেখিবার সাধ মিটিল না। ক্ষণেকের তরে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই স্মৃতি উথলিয়া উঠিল। আলো নির্ব্বাপিত করিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম উষা আগত প্রায়; আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না; প্রভাত হইলে আমার সঙ্কল্পে বাধা পড়িতে পারে এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিলাম না, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল; গ্রামের বাহিরে আসিয়া মনে করিলাম যে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা না করিয়া যাওয়া ভাল হয় না; এই মনে করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। মধ্যাহ্নকালে, পদব্রজে, পাগলের ন্যায় আসিতে দেখিয়া বাটীর সকলেই বিস্মিত হইলেন। মা আসিয়া তাড়াতাড়ি আমার এরূপভাবে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম "যে সেখানে ভাল মন টিক্‌লনা তাই চলে এলাম্"। মা আমার মুখ মুছাইয়া জল খাইতে দিলেন।

সন্ধ্যার সময় শ্বশুরমহাশয় আমার অনুসন্ধানের জন্য আমাদের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইল। বাবাকে বলিলেন "যে কি জানি কি কারণে বাবাজী

বাটীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে; বাটীতে কান্না-হাটী পড়িয়াছে; আমার সঙ্গে কল্য প্রাতেঃই পুনর্ব্বার আমাদের বাটী পাঠাইতে হইবে।" তাঁহার সঙ্গে যে লোকটী আসিয়াছিল, সে গোপনে আমার হাতে একখানি পত্র দিল, পত্রখানি এইরূপঃ—

হৃদয় সর্ব্বস্ব—

আমার অজ্ঞাতসারে তুমি চলিয়া গিয়াছ। বুঝিয়াছি আমার অভিমানই তাহার কারণ। কিন্তু আমার অভিমানের কারণ তুমি নও কিম্বা অন্য কেহ নহে; আমিই আমার অভিমানের কারণ। তবে তোমাকেও আমা হইতে অভিন্ন জানিয়া তোমার উপর সে অভিমান প্রকাশ করিয়াছিলাম। তোমার অভাবে যে আমি কিরূপ আছি তাহা প্রকাশ করিয়া জানাইবার ক্ষমতা নাই; যাহা হউক সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া একবার এখানে আসিবে। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব। ইতি

শ্রীচরণাশ্রিতা,

শ্রীমতী চঞ্চলাবালা দাসী।

পত্রখানা পড়িয়া মনটা বড় চঞ্চল হইল, মনে করিলাম না বলিয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আসাটা ভাল হয় নাই। এমন সময়ে বাবা আমাকে ডাকিয়া শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি চুপ করিয়া রহিলাম; তিনি "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" জানিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। আমিও পরদিন প্রাতে শ্বশুরের সহিত পুনর্ব্বার শ্বশুরবাড়ী আসিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে 'সেই মুখখানি' আবার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই নীল নলিনীর আভাযুক্ত উজ্জ্বল নয়নের ভ্রমর-কৃষ্ণ তারা দুটি আমার শুষ্ক বিবর্ণ চক্ষুর সহিত সম্মিলিত হইল। মনে করিয়াছিলাম আগে বিদায়ের কথা বলিব, কিন্তু তাহা হইল না। মৃদুস্বরে বলিলাম "তোমার সেদিনের অভিমানের কারণ কি?"

বালিকার দুটি নয়ন কোণে মুক্তাবিন্দু সদৃশ দুটি অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সেই দুইটি অশ্রুবিন্দুই যেন নীরব ভাষায় তাহার সমস্ত মনোভাব ব্যক্ত করিয়া দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল "প্রাণপ্রতিম জানই ত আমি বাল্যকাল হইতে একটু অভিমানিনী, আমি বাবার আদরের মেয়ে ছিলাম; কেহ কখন কৌতুক করিয়া কোন কথা বলিলেও তাহা সহ্য করিনাই। তবে সেদিনের অভিমানের কারণ তেমন কিছু গুরুতর নহে। দাদা বৰ্দ্ধমান হইতে বড় বৌয়ের জন্য এক শিশি সুবাসিত নারিকেল তৈল আনিয়া আলমারীর মধ্যে রাখিয়াছিলেন। আমি তাহা দেখিতে পাইয়া মনে করিলাম যে যখন দাদা আনিয়াছে তখন ইহাতে আমারও অধিকার আছে; এই মনে করিয়া তাহার খানিকটা আর একটা শিশিতে ঢালিয়া লইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে বড় বৌ আসিয়া আমার হস্ত হইতে তৈলের শিশি কাড়িয়া লইল এবং বলিল "যদি এতই তেল মাখবার সাধ তবে ঠাকুরজামাইকে বলিস্ এনে দেবে।" সেই কথাগুলি আমার হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ অভিমান আরও বাড়াইয়া দিল, সকল কথা তোমাকে বলিবার জন্য পুঁজি করিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু সেদিনে মনের আবেগে বলিতে পারি নাই। কে জানিত যে তাহাতে এইরূপ বিষময় ফল হইবে। যাহাই হউক যদি অপরাধ হইয়া থাকে তবে ক্ষমা করিবে।" আমি সেই কথা শুনিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না; বলিলাম "এরই জন্য এত।" এই বলিয়া কলিকাতাস্থিত কোন বন্ধুকে পত্রপাঠ মাত্র ফেরত ডাকে এক শিশি পদ্মগন্ধ, এক শিশি গোলাপ গন্ধ দুই শিশি কুন্তলীন, একটি দেলখোস ও একটি তাম্বুলীন পাঠাইয়া দিতে পত্র লিখিলাম।

ইহার পরে চারিদিন বেশ আমোদ প্রমোদে কাটিয়া গেল। আমার পূৰ্ব্ব কল্পিত সঙ্কল্প মন হইতে একবারেই অপসারিত হইল এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতাজনিত কষ্টও অনেকটা বিস্মৃত হইলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমরা

স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করিতেছি এমন সময়ে ডাকে কুন্তলীনের পার্শেল আসিয়া পৌঁছিল। আমি পার্শেল খুলিয়া জিনিষগুলি আমার স্ত্রীর হাতে দিলাম। সে একটু পদ্মগন্ধ কুন্তলীন লইয়া আমার চুলে মাখাইয়া দিল এবং কঙ্কতিকা সহকারে মস্তকোপরি একখানি দিব্য ইস্ত্রী করা টেরি প্রস্তুত করিল। আমিও খানিকটা গোলাপগন্ধ কুন্তলীন তাহার মাথায় মাখাইয়া দিয়া তাহার শোধ লইলাম ও তাহার নাকের নোলকে একটু দেল্‌খোস্ লাগাইয়া দিলাম। সে কিন্তু গায়ে রাখিল না; তাম্বূলীন মিশ্রিত একটি পান প্রস্তুত করিয়া আমার মুখের মধ্যে পূরিয়া দিল। আমি পরাজিত হইলাম। কিন্তু তাহার দেল্‌খোস সুবাসিত ফুল্ল অধর হইতে আমার পান চিবাইবার পরিশ্রমের ফী আদায় করিয়া লইলাম।

এমন সময়ে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিলোল কটাক্ষশালিনী, মরালগামিনী বড় বৌ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ভাই তোমাদের ঘরে পদ্ম ফুলের আর গোলাপ ফুলের বাস আস্‌ছে কেন?" আমার স্ত্রী মৃদুহাস্য সহকারে বলিল "দেখ্‌তে পাচ্ছনা যে তোমার ঠাকুরজামাইটী পদ্মফুল আর আমি গোলাপফুল।"

এই বলিয়া আমার স্ত্রী দুইটি ভিন্ন রকম শিশিতে ঢালিয়া দুই রকমের কুন্তলীন কিছু কিছু পরিমাণে তাহার হাতে দিল এবং "আর এই নাও দানের দক্ষিণা" এই বলিয়া তাহার মুখে খানিকটা দেল্‌খোস মাখাইয়া দিল ও তাম্বূলীন মিশ্রিত একটি পান তাহার মুখের মধ্যে পূরিয়া দিল।

বড় বৌ। এই বুঝি সেদিনের প্রতিশোধ?

আমার স্ত্রী। তবে তাই।

আমি ইত্যবসরে একটি ছোট রকমের হাসি হাসিয়া লইলাম। বড় বৌ একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী"। আমার স্ত্রী একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "তা হবে না কেন?"

শ্রীকামিনীকান্ত রায়।
৮৪নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাশিতে অবিলম্বেই বিষাদের ছায়া প্রতিফলিত হইল! কোন অপরিজ্ঞাত রহস্য অচিন্তনীয় ব্যথায় তাহার কোমল হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় ভীত হইয়া সে মনে মনে বলিয়া উঠিল "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, স্বর্গীয়া দেবী! আমার প্রতি অপ্রসন্না হইও না। আমি তোমার প্রীতি সাধন করিতে ও প্রিয়তমের হৃদয়ে তোমার প্রেম-প্রতিমার স্মৃতি অনুরাগরঞ্জিত রাখিতে আজীবন প্রয়াস পাইব; এই সুমহৎ প্রতিজ্ঞা পালনে তুমি আমার সহায়তা করিও।" পুষ্প বুঝি ভাবিতেছিল যে, তাহার পূর্ব্বে যে ব্রততী এই সহকারকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই ভাগ্যবতী আজি কোথায়? নির্ম্মম কাল অকালে সুখ শান্তির ত্রিদিব স্বামীর ক্রোড় হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিলেও, তিনি রমণীর অদেয়, জীবনসর্ব্বস্ব পতিধনকে বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন কি না, কে বলিবে? হয়ত বিবাহের সময় কোন অনির্দ্দিষ্ট, অদৃশ্য লোক হইতে তাঁহার প্রেম-বিপ্লাবিত, সকরুণ, সজল আঁখি দুইটি, প্রবোধের প্রেমপূর্ণ মুখখানির প্রতি সতৃষ্ণভাবে তাকাইয়া তাহার প্রতি দারুণ অভিসম্পাত বর্ষণ করিতেছিল! তাই বুঝি অমূল্য পতিপ্রেমরত্ন অপহৃত হইবার ভয়ে সে আতঙ্কিতা হইয়া উঠিয়াছিল?

সপত্নীর অভিশাপে, নিয়তিচক্রের আবর্ত্তনে বা বিশ্বনিয়ন্তার অভি-প্রায়ে—যে কোন কারণেই হোক্ পুষ্পের এই অমূলক আশঙ্কা যে অকাট্য সত্যে পরিণত হইতে পারে, তাহার আর বিচিত্র কি?

এদিকে রাত্রি অধিক হওয়ায়, বাসরস্থিতা কামিনীগণ একে একে অপসৃতা হইলে প্রবোধ প্রেমভরে পুষ্পের অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিতে গিয়া তাহার অতুলনীয়রূপে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অধিকন্তু সেই অনুপম লাবণ্যে দীনতা, পবিত্রতা ও সরলতার সমাবেশ এবং অনিন্দনীয় আনন খানিতে দ্বেষ হিংসার অতীত স্বর্গীয় সদ্ভাবের সম্যক বিকাশ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে পরিপ্লুত হইল, হৃদয় আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তাহার মুখে চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা পর মুহূর্ত্তেই নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "পুষ্প! কি ভাবিতেছ?"

সেই সুমধুর স্পর্শের প্রভাবে, সেই সকরুণ স্বরের অমৃত স্রোতে পুষ্পের চিন্তার তরঙ্গগুলি নিমেষে ভাসিয়া যাওয়ায়, তাহার অন্তরাকাশে মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় পুনর্ব্বার সুবিমল সুখের সুস্নিগ্ধ আলোক রেখা ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু মুখে একটি কথাও সরিল না।

প্রবোধ সন্দিগ্ধ হইয়া অধিকতর কাতরভাবে বলিলেন "পুষ্প! তুমি কি এই বিবাহে নিতান্তই অসুখী হইয়াছ? তোমার চিন্তার বিষয় ক আমাকে জানিতে দিবে না?"

পুষ্পের প্রেমনত বিশাল নয়ন দুটি জলে ভরিয়া আসিল; সে বহু কষ্টে লজ্জার বাঁধ অতিক্রম করিয়া অতি সাবধানে অতি ধীরে ধীরে বলিল "তুমি আর ঐরূপ মনে করিয়া বিষাদিত হইও না। আমি আমার পূজনীয়া, পরলোকগতা ভগিনীর নিকট তাঁহার পরিত্যক্ত গুরুতর দায়িত্ব বহন করিবার উপযুক্ত শক্তি ভিক্ষা করিতেছিলাম, আর তাঁহার স্মৃতি তোমার হৃদয়ে জীবন্ত রাখিতে যত্নবতী থাকিব, এই প্রতিজ্ঞা করিতেছিলাম মাত্র।—আর কিছু নহে।"

অমৃতনিষ্যন্দিনী ভাষায় এই অমর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রবোধের উন্নত, উদার হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় মধুর তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি আবেগভরে পুষ্পের বিকম্পিত পুষ্পপুট-তুল্য ওষ্ঠাধর স্বন করিয়া বলিলেন "পুষ্প! দয়াময়ের কৃপায় তোমাকে পাইয়াছি; তুমি আমার নিরাশার অন্ধকারে আশার বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিলে! জগদীশ্বর তোমার সর্ব্altবিধ মঙ্গল করুন।" অতঃপর রজনী প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া নব দম্পতী অগত্যা বিবিধ সুমধুর প্রেমালাপ স্থগিত রাখিয়া, কুসুম সুবাসিত শুভ্র শয্যায় গাত্র ঢালিয়া দিলেন এবং অনতিবিলম্বেই সুষুপ্তি দেবীর স্নেহ প্রসারিত আরামদায়িনী কক্ষে আশ্রয় লাভ করিলেন।

(৩)

পুষ্পের বিবাহের পর দুইটি মধুমাস কালের অতলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। যেদিন প্রভাত সূর্য্যের কনক-কান্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শোকাতুর পিতা ও ভূম্যবলুণ্ঠিতা জননীর স্নেহপূর্ণ বক্ষঃ হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে পুষ্প শ্বশুরের অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, বিচিত্র অট্টালিকায় করুণা ভিখারিণীর ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিল—আজি আর সেদিন নাই। এখন সে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে নিরপেক্ষ করুণার বিতরণে সততই মুক্তহস্ত, এবং সুকুমার সৌন্দর্য্যের সহিত বিবিধ স্বর্গীয় গুণের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় সমাদৃতা। ঐকান্তিক ভক্তি, নিঃস্বার্থ প্রেম ও প্রগাঢ় স্নেহের মধুর যোগে গৃহিণী হইতে দাস দাসীর হৃদয়ে পর্য্যন্ত ইহারই মধ্যে এরূপ প্রীতিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে, তাহার পিত্রালয় গমন-জনিত ক্ষণ-অদর্শন ও সকলেরই মনে এক বিষাদময়ী অতৃপ্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। তাহার আনন্দবর্ষী আননখানি নয়ন পথে উপস্থিত হইলেই মাতৃহীন শিশু দুটি সেই স্নেহ-অঙ্ক অধিকার পূর্ব্বক স্বর্গসুখ অনুভব করে, পরিবারস্থ শোকাতুর ব্যক্তি শান্তিলাভ করে, পীড়িত পীড়ার দারুণ যাতনা বিস্মৃত হয় এবং বিষাদ-ব্যথিত মলিন মুখেও ক্ষীণ হাস্যলেখা বিকাশ পায়। কেবল পরিতৃপ্ত হয় না পিসীমার বিদ্বেষপূর্ণ কঠোর হৃদয়। প্রবোধকে যাদুমন্ত্রে ভুলাইয়া বাছা দুটিকে পর করিয়া দিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া "বৌমার চাঁদপানা মুখ" তাঁহার চক্ষুশূল হইয়াছে।

"যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা"।—সুতরাং পুষ্পের মহত্ত্বের পরিচায়ক প্রত্যেক কার্য্যই পিসীমার চক্ষে ঘোর ধূর্ত্ততা ও শঠতাপূর্ণ ভণ্ডামি ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াই প্রতিভাত হয় না। সপত্নী তনয় দুটির প্রতি তাহার অত্যাধিক স্নেহকে পিসীমার "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ" বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে।

শিশু দুটির মধ্যে একটি চারি বৎসরের, অপরটির এখনও এক বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। এই অপগণ্ড দুধের ছেলেদিগকে স্নেহের কুহকে ভুলাইয়া পাছে মায়াবিনী সৎমা তাহাদিগের কোন অনিষ্ট সাধন করে, এই ভয়ে তিনি ডাকিনী বধূর নিকট হইতে সোণার পুতুলদিগকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখিতে প্রয়াস পান; কিন্তু ষোল আনা অকৃতকার্য্য হওয়ায় বধূর উপর তাঁহার আক্রোশ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। অনেক সময়ই এই ধেড়ে বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে আইবুড় রাখার জন্য তিনি তাহার নিরীহ

পিতা মাতার উপর কঠিন মন্তব্য প্রকাশ ও নিরপরাধী চৌদ্দ পুরুষের নরক গমনের বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন; এবং প্রায় প্রতি-দিনই দুপুর বেলায় নিজের জপজপের পবিত্র ঘরটিতে বসিয়া, অতি সুললিত ভাষায়, সমাগতা মহিলা সভ্যাগণের সহিত সংমার জটিল চরিত্র ও কুটিল ব্যবহাররূপ মহাশাস্ত্রদ্বয়ের সম্যক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

পুষ্প ও পিসীমার সকল প্রকার কথার খোঁটা হাসি মুখে সহ্য করে। কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে, তাহার স্নেহপ্রদীপ্ত বক্ষঃ হইতে আবদারগ্রস্ত শিশু দুইটিকে যখন পিসীমা বাঘিনীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিয়া লন, তখনই কেবল সে বিষাদিত মনে, নিতান্ত দুঃখিনীর মত বিরলে বসিয়া তাহা-দিগের করুন চিৎকারের সহিত নিজের নীরব অশ্রুধারা মিশাইয়া থাকে।

কৌশলময়ী আত্মগোপন ক্ষমতায় পিসীমার বিষয় প্রবোধচন্দ্রের সম্পূর্ণ অগোচর রাখিয়া পুষ্প তাঁহার অপরিসীম আনন্দ অনাহত রাখিয়াছে। বিবাহ বাসরের প্রতিজ্ঞা সুচারুরূপে পালন করিয়া সে প্রবোধকে অধিকতর সুখী করিয়াছে।

এইরূপে স্বামীর সহিত একাত্মা হইয়া, মাতৃহীন শিশুদিগের মা হইয়া ও পিসীমার অনাদর বশতঃ অন্যান্য সকলের সমধিক সমাদরের পাত্রী হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পুষ্প এক অভাবনীয় বিপদে পতিত হইল।

(৪)

দুপুর বেলা, চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পরিচারিকা বামীর মা এক মাসের অবসর লইয়া দেশে যাওয়ায় তাহার একাদশ বর্ষীয়া বালিকা বামীর নিকট খোকাকে রাখিয়া খোকার ঝি স্নান করিতে গিয়াছে। শ্রম-বিমুখ বামী স্বীয় জননীর ভুল ক্রমে পরিত্যক্ত আফিংএর কৌটাটি খেলিতে দিয়া খোকাকে অনায়াসেই বসাইয়া রাখিয়াছে।

দোতালায়, প্রবোধ পালঙ্কোপরি শয়ন পূর্ব্বক বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন এবং পুষ্প নিকটস্থ আলমারি উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহার

আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি বাহির করিয়া রাখিতেছে, এমন সময় বড় খোকা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আলমারিস্থিত সুরম্য ও পরিপূর্ণ দেল-খোসের শিশিটির প্রতি সতৃষ্ণ নয়ন যুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক বলিল "মা আমি ঐ শিশিটি নেব।" স্নেহময়ী মাতা একটি মধুর চুম্বনসহ শিশিটি তাহাকে প্রদান করিবামাত্র সে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

পরক্ষণেই বামী আসিয়া হাজির! সে বড় খোকার অনুরূপ একটি খাস্‌বয়ের শিশি নিতান্ত ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করায়, সহৃদয়া পুষ্প তদনুরূপ পূর্ণ শিশি আর নাই দেখিয়া, একবোতল কুন্তলীন বিতরণ পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় করিল।

প্রসন্ন চিত্তা বামী অনুরাগপূর্ণ অতৃপ্তনয়নে সেই সুনির্ম্মল তৈলপূর্ণ, স্ফটিক পাত্রটির পানে চাহিয়া চাহিয়া ছিপি খুলিয়া ফেলিল এবং স্বীয় কেশদামকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন করিবার আশায় একটুখানি হাতে ঢালিতে যাইবে, এমন সময় খোকার হাতে আফিংয়ের কৌটা আছে সহসা মনে পড়িয়া যাওয়ায়; জগৎ সংসার বিস্মৃত হইয়া কম্পিত হৃদয়ে ছুটিয়া আপন কক্ষে উপস্থিত হইল ও খোকার কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া সকলের অলক্ষ্যে পিসীমার ঘরে শয়ন করাইয়া রাখিয়া আসিল, এবং নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও কাতর চিত্তে হরির নিকট ও মা কালীর নিকট এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিবিধ মানসিক করিতে লাগিল।

হায়! বিষম ভয় প্রপীড়িতা অবোধ বালিকা এই নিদারুণ কথা সকলের অগোচর রাখিয়া কি মহা অনর্থই না সংঘটন করিল!!

এ দিকে বামী বিদায় হইবার পর পুষ্প প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ পতির সহিত প্রেমালাপ ও তাঁহার সেবায় রত থাকিয়া বিপুল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, এমন সময় পিসীমার বিকট চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হওয়ায় প্রবোধ আতঙ্কিত হইয়া এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া বারাণ্ডাভি-মুখে ধাবিত হইলেন, পুষ্প ও কম্পিত হৃদয়ে পতির অনুগমন করিল।

প্রবোধকে দেখিয়া পিসীমা চীৎকার পূর্ব্বক বলিলেন "বাবা, সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—রাক্ষুসী সৎমা ছেলেকে বিষ খাওয়াইয়াছে,—আর রক্ষা নাই,—শীঘ্র ডাক্তার ডাক।"

পুষ্প সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মৃতবৎ শিশুকে পাগলিনীর ন্যায় পিসীমার ক্রোড় হইতে লইতে যাওয়ায়; পুত্র স্নেহে দিশাহারা, বিঘোর মস্তিষ্ক প্রবোধ ভীম পদাঘাতে তাহাকে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া উন্মত্তের মত ডাক্তারের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

ডাক্তার বাবু আসিয়া, আফিং তুলিয়া ফেলিয়া অনেক কষ্টে এযাত্রা শিশুকে রক্ষা করিলেন।

শিশু নয়ন উন্মীলন করিয়াই বজ্রাহত মাতার নিকট যাইবার জন্য সুকোমল বাহু দুটী সম্প্রসারণ করিয়া দিল, পুষ্পও মানাপমান বিস্মৃত হইয়া শিশুকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার ধাবিত হইল। কিন্তু হায়! কে শিশুকে দিবে? সকলেরই তীব্র তিরস্কার ধিক্কার ও ব্যঙ্গোক্তি সেই হতভাগিনীর অসহায় মস্তকোপরি মুষলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল।

(৫)

পুষ্পের দিন যামিনী কি ভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল, তাহা কবি-কল্পনার অতীত। অভাগিনীর মনোব্যথার পরিসীমা নাই। তাহার হর্ষোদ্ভাসিত আননের বিকসিত শতদলসম শোভা বিমলিন হইয়া গিয়াছে, সুচারু অধরের তীরে প্রশান্ত নির্ম্মল হাসির অপরূপ লীলা অপহৃত হইয়াছে, সতত প্রসন্ন নলিন নয়ন দুটি বিষাদ জলদাবৃত হইয়া শ্রাবণ ধারায় অশ্রু নিপতন করিতেছে ও ললিত কোমল দেহ-লতিকাখানি ছিন্ন মৃণালবৎ ধূলি ধূসরিত হইতেছে! আহা! শাখাচ্যুত বিশুষ্ক পদদলিত কুসুমের ন্যায় কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। আর সকলই সে অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু প্রবোধের অবিশ্বাস ও ঘৃণাই তাহার মর্ম্মান্তিক হইয়াছে; তাহার ভীষণতাকে শিশু দুটির বিচ্যুতি আরও প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার এই

সমুদ্র সমান অতলস্পর্শী বিপদে বিন্দুপ্রমাণ শান্তি—রামজীবন বাবুর সান্ত্বনা ও বামীর সহানুভূতি।

রামজীবন বাবুর হৃদয়ে তাঁহার "মা লক্ষীর" প্রতি অবিশ্বাস নিমেষের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হয় না। বামী ত তাহার নির্দ্দোষীতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছে। এই শোচনীয় ঘটনা পুষ্পের পিতা মাতার অগোচর রহিল না। মর্ম্মাহত ডেপুটী বাবু লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়াও নিজে কন্যাকে লইতে আসিলেন, কিন্তু আদরের দুহিতা পিতার চরণে ধরিয়া সে সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল।

এদিকে শ্বশুর গৃহের উপেক্ষায় অনাদরে ও অনাহারে অনিদ্রায় এবং নিদারুণ মনোবেদনায় ও দুশ্চিন্তা জালের ভীম নিষ্পেষণে পিষ্ট হইয়া সে সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইল।

তখন জীবন্মৃত পিতা মাতা সেই শীর্ণা সংজ্ঞাহীনা তনয়াকে আপনাদের স্নেহ-অঙ্কে লইয়া আসিয়া, তাহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ ও সর্ব্বস্বপণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

পুষ্পের পিত্রালয় গমনের চারি পাঁচ দিন পরে বামীর মা দেশ হইতে প্রত্যাগত হইল এবং বৌদিদিমণির অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইল। বামীকেও নিতান্ত কৃশ ও বিমনা দেখিয়া সে আহারাদির পর গোপনে ডাকিয়া বড় স্নেহভরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,—পুষ্পের ক্লেশে ও দুঃখে মর্ম্মান্তিক আহতা বামী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং খোকার আফিং খাওয়ার রহস্য ভেদ করিয়া পুষ্পের যাতনার কথা বর্ণনা করিল।

ভয়াতুরা কন্যার শত কাতরোক্তি ও নিষেধ উপেক্ষা করিয়া আপনাদের ইষ্টানিষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেও অবকাশ না পাইয়া সেই অশিক্ষিতা নীচ জাতীয়া বামীর মা তৎক্ষণাৎ প্রবোধের কক্ষ পানে ধাবমান হইল।

(৬)

হতভাগ্য ডেপুটী বাবু পুষ্পকে লইয়া যাইবার পর,—রবিবার দিন দুপুর বেলা প্রবোধ আপন নির্জ্জন কক্ষটিতে বসিয়া নিজের দুরদৃষ্টের

বিষয় চিন্তা পূর্ব্বক অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে রোদন-বিহ্বলা বামীর মা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল এবং বহু আক্ষেপপূর্ণ, বিলাপ সম্বলিত ভূমিকাসহ খোকার আফিং খাওয়ার আমূল ঘটনাটি বিবৃত করিল।

এক মাস যাবৎ চিন্তা বিকারে সমাচ্ছন্ন, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক প্রবোধ এই যুগপৎ হর্ষ বিষাদের গুরুভার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সংজ্ঞা বিহীন হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গে প্রবোধ স্নিগ্ধ মধুর বাক্যে বামীর মাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক শ্বশুরালয়াভিমুখে প্রধাবিত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া সেই কাতর ক্রন্দন নিনাদিত, মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস হিল্লোলিত পুষ্পের শয়ন কক্ষে উন্মাদের ন্যায় প্রবিষ্ট হইলেন।

হায়! তখন জীবনব্যাপী হাহাকার ব্যতীত প্রবোধের আর সকলই ফুরাইয়াছে; তাঁহার আসিবার ক্ষণ পূর্ব্বেই পুষ্পের নিষ্কলঙ্ক প্রাণপক্ষী পরম রমণীয় দেহপিঞ্জর ভগ্নপূর্ব্বক এ পাপ পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় লইয়া অনন্তের আরামপূর্ণ চরণতলে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য বড় আগ্রহের সহিত আনন্দধামের যাত্রী হইয়াছে!—

পড়িয়া রহিয়াছে শুধু—অলৌকিক মধুর চরিত্রের সকরুণ সুধাময় স্মৃতি!

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ
মেদিনীপুর।



দ্বাদশ পুরস্কার ৫৲

সরোজিনী

এফ্ এ পরীক্ষা দিয়া একবার বাড়ী যাইয়াছিলাম। তাহার পর বি এ পাস করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করা অবধি নানা কারণে বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই ; কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়া শুনা করিতেছিলাম। এবার বাড়ী হইতে ঘন ঘন চিঠি আসায় আজ পাঁচ বৎসরের পর গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছি।

সেরূপ সুখ জীবনে আর কখনও হইবে কিনা জানি না। আজ অনেক দিন হইল সে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তবু এখনও মার আনন্দোৎফুল্ল মুখ, ছোট ছোট ভাই ভগ্নীদের আনন্দ উচ্ছ্বাস যেন চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। যে প্রবাসী সেই জানে সে সুখ কি নির্ম্মল, কি গভীর। বুঝি বা আমার পক্ষে সে সুখ দ্বিগুণ হইয়াছিল। কেননা তখনও সংসার সাগরের হলাহল আমার ভাগ্যে উঠে নাই, আজীবন কৃতকার্য্যতা ভোগ করিয়া নৈরাশ্য কথামাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল এবং নূতন উদ্যম ও নূতন উৎসাহের দর্পণে পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়াই মনে হইত।

বাড়ী আসিয়া সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইলাম। যেদিকে দেখি সমস্তই পরিচিত, অথচ পাঁচ বৎসরের অনুপস্থিতি তাহাতে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য মাখাইয়া দিয়াছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম শ্বেতকবি যে বলিয়াছিলেন দূরত্বই দৃষ্ট বস্তুকে মনোহর করে তাহা সত্য বটে। এখানেই বলিয়া রাখা ভাল, আমি মনে মনে কবি ও কবিত্বের বড় পক্ষপাতী এবং আমার নিজের মনও যেন কিঞ্চিৎ কবিত্বভাবাপন্ন, তবে তখন সহপাঠীদের বিদ্রুপের ভয়ে বাহিরে কবিত্ব প্রভৃতি সকলই বিকৃত মস্তিষ্কের ফল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

এই পাঁচ বৎসরে গ্রামে পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে। আমার ঠাকুরদাদা মারা যাওয়ার পর আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধদিগের যে এক বৃহৎ মিটিং হইত তাহা আর হয় না। যাহাদের বালক দেখিয়াছি তাহাদের গোঁফের রেখা দিয়াছে। আমার সমবয়স্কদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঘোরতর সংসারী হইয়া পড়িয়াছেন। চণ্ডে, যাহার দৌরাত্মে কাহারও গাছে আম কাঁঠাল থাকিত না, যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বালকদিগের উপর রাজত্ব করিত, এখন দেখি সে নিরীহ ভদ্রলোকের মত হুঁকা হাতে তাহার ছয় মাসের মেয়েটিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমিও আর সেই অজাতশ্মশ্রু বালক নহি। ভূষণ ঠাকুদ্দা তো চোখে চসমা দিয়া নিরীক্ষণ করিয়াও আমাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। পরে পরিচয় পাইয়া বলিলেন "আরে বস বস দাদা, এ কয়দিনে এত বদলে গিয়েছ যে চিনতেই পারা যায় না"। বিহারী খুড়ো তাঁহার অদৃষ্ট ও তাঁহার পুত্র হরিশের প্রচুর নিন্দা করিয়া বলিলেন "কলকাতায় থাক বাবা, কত সাহেব স্থবোর সঙ্গে আলাপ আছে, হরিশের একটা চাকরী যদি জুটিয়ে দিতে পার।" রাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে দেখিয়া মহা খুসী হইয়া এক টিপ নস্য লইয়া বলিলেন "আমরা চিরকালই জ্ঞাত ছিলাম বিলয় সংসারে উন্নতি করিবে। বেশ বেশ বাপু, গ্রামের মুখ উজ্জ্বল কর, ক্রিয়া কান্ডে পিতৃপিতামহের নাম রক্ষা কর"।

অতি শীঘ্রই আমি গ্রামের মধ্যে "কৃষ্ণ বিষ্ণুর" মধ্যে একজন গণ্য হইলাম। গ্রামের মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের সম্ভ্রম প্রতিপত্তি একেবারে লোপ পাইবার উপক্রম হইল কেননা আমি বর্ত্তমানে তাঁহাকে কেহই 'অথরিটি' বলিয়া স্বীকার করে না। একদিন আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে আমার গ্রামে পদার্পণের দুই ঘণ্টা পরেই পাড়ার বর্ষিয়সীগণ "বাড়ুয্যেদের সোণার চাঁদ ছেলের" বিবাহটা যে অচিরেই কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়াছেন। সেই খবর পাইয়া আমি (মেসেতে যাহার 'সাত চড়ে কথা বাহির হয় না' বলিয়া কলঙ্ক ছিল সেই আমি) আমাদের বহির্বাটির রোয়াকে বসিয়া পাড়ার বিস্ফারিত

লোচন যুবক ও গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনকারী প্রৌঢ়দিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অতি গম্ভীর ভাবে, বিষদরূপে মিল, ফসেট প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইলাম যে আমাদের দেশে পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করিয়া দুর্ব্বল সন্তান উৎপাদন দ্বারা লোক-সংখ্যা ও দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি করা কিছুতেই উচিত নহে। ইহার পরদিনই আমি যে একজন ভারি বিদ্বান তাহা গ্রামের মধ্যে সিদ্ধান্ত হইয়া গেল।

একদিন আমি বাড়ীতে আহার করিতেছি মা কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখি বাটির ও প্রতিবেশীদিগের এক দল বালক বালিকা অদূরে দাঁড়াইয়া আমার আহার ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাদের সহিত আমার ইতিমধ্যেই বেশ আলাপ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। আমি কাহাকেও বা মিষ্টবাক্যে কাহাকেও বা মিষ্টদ্রব্যে আপ্যায়িত করিতেছি এমন সময় মা বলিলেন "দেখ দেখি বিনয়, কেমন মেয়েটি'। 'মেয়েটি' শুনিয়াই আমার অকস্মাৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অতি কষ্টে, মা যেদিকে দেখাইলেন সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম এক জোড়া অতি সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষু একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছে। যাহার চক্ষু, তাহার বয়স এগার বৎসরের বোধ হয় অধিক হইবে না, কাজেই আমি সাহস পাইয়া বলিলাম "বেশ মেয়েটি তো, কার মেয়ে মা ?" মা বলিলেন ওটি আমাদের হরি মুখুয্যের মেয়ে ; হরি মুখুয্যেকে জান না ? আর জানবেই বা কেমন করে, ওরা আজ পনর বছর বিদেশে ছিল, এই আর অঘ্রাণ মাসে এসেছে। বেশ শিষ্ট শান্ত মেয়েটি, আমি তোমার সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছি।" আমার মনে কবিজন সুলভ কোপের উদয় হইল, ভাবিলাম "হাঁ, দশ বৎসরের একটা মেয়ে বিয়ে করে তাকে 'মানুষ' করি আর কি ?" মুখে কিছু না বলিয়া নীরবে আহার করিতে লাগিলাম।

তাহার পরদিন সকালে আমার কাছে পাড়ার যত ছেলে মেয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাহারও ফরমাস "কাগজের নৌকা করে দাও", কেহবা আব্দার ধরিলেন "একটা গল্প বল", কেহ বা "হঁা গল্প

বলিতে বুঝি কত্ত হয় না ; তুমি বলো না বিনয় দাদা” বলিয়া আমার কোলে উঠিয়া বসিয়া তাঁহার যে আমার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব আছে ও তিনি যে আমার দুঃখে দুঃখী তাহা স্পষ্ট প্রমাণ করিলেন। আমি যথাসাধ্য সকলের আজ্ঞা পালন করিতেছি, এমন সময়ে ছোট ভাইটীকে কোলে করিয়া গত কল্যকার মেয়েটী ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। আমি একটু বিস্মিত হইলাম ; যেখানে বিবাহের কথা হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা তাহার ত্রিসীমায় যায় না, তবে কেন এ এখানে উপস্থিত হইল ? ভাবিলাম, বোধ হয় মেয়েটী কিছু বাচাল কিম্বা লজ্জাহীনা। আমি আবার মানব চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে বড় ভালবাসিতাম। কথার ছন্দ, দাঁড়াইবার ভাব, হাত মুখের ভঙ্গি প্রভৃতি দেখিয়া লোকের চরিত্র সম্বন্ধে মোটামুটী একটা ধারণা স্বতই হইয়া থাকে। যাহারা আবার যত্ন পূর্ব্বক ঐ বিষয় শিক্ষা করে তাহাদের পক্ষে উহা বড়ই আমোদজনক। আমি ঠিক করিলাম, মেয়েটী কিরূপ দেখিতে হইবে। এস্থলে একটু অতিরিক্ত কৌতুহল বোধ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

আমি ছেলেদের লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম, মেয়েটী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার নাম কি ?” অতি ধীরে চক্ষু না নামাইয়াই সে উত্তর দিল “সরোজিনী”। আমি তাহার মুখের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার ভাইয়ের বয়স কত ?” সে বলিল “এক বৎসর।” আমি আর তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। সেও আর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। আমি সিদ্ধান্ত করিলাম তাহার লজ্জাহীনতার কারণ বাচালতা নহে—সরলতা। ওয়ার্ডস্ ওয়াথের কবিতা মনে পড়িল—সরলা বালিকা—সে লজ্জার কি জানিবে ? আমাদের মেয়েরা সাত বৎসর বয়সেই অকালপক্কতা লাভ করে। সরোজিনী সেরূপ নহে দেখিয়া আমি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলাম।

দিন কয়েক মধ্যেই সরোজিনীর সহিত আমার বেশ চেনাশুনা

হইয়া গেল। আমার অমত বুঝিয়া মা আর আমার বিবাহের কথা তোলেন নাই। কাজেই সরোজ ও আমার মিশিবার বড় বেশী সঙ্কোচের কারণ ছিল না। সে আমাকে বিনয়দাদা বলিয়া ডাকিত, আমিও যেমন অন্যান্য ছেলেদের সহিত মিশিতাম সরোজের সঙ্গেও তেমনই নিঃসঙ্কোচে মিশিতাম। সে তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে শুনিয়া আমি তাহাকে কিছু কিছু পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। আমি দেখিতাম পড়ার সময়ে কিম্বা অন্য কোন সময়ে, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে সে কখনই কথা কহিত না। প্রথম প্রথম মনে করিতাম সে বড় একটা কিছু বুঝিতে পারে না, সেইজন্য চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু দুই চারিবার প্রশ্ন করায় বুঝিলাম সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তাহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম; মনে হইত বোধ হয় পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকে যে কোন বিষয় শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে। আমি আরও লক্ষ্য করিলাম তাহার চক্ষু দুইটি বাস্তবিকই "আত্মার গবাক্ষ" অর্থাৎ তাহার চক্ষু দুইটি দেখিলেই "নির্ম্মল নদী-জল-তলে উপল খণ্ডের ন্যায়" তাহার অন্তরের ভাব স্পষ্ট বুঝা যায়। ক্রমে ক্রমে আমি তাহার গুণাবলীর পরিচয় পাইতে লাগিলাম। দেখিলাম যে তাহার অন্তঃকরণ দয়াতে গঠিত ও তাহার সহিষ্ণুতা অসাধারণ এবং এই অল্প বয়সেই তাহার মনের দৃঢ়তার বেশ আভাষ পাইলাম। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমি তাহার প্রতি কেমন একটু আকৃষ্ট হইলাম। শিক্ষক তাঁহার বুদ্ধিমান ছাত্রের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হন, বোধ হয় তখন আমি সরোজের প্রতি ভিন্নভাবে আকৃষ্ট হই নাই।

ক্রমে ছুটি ফুরাইয়া আসিল, আমিও সকলের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

কলিকাতায় থাকিতে বাড়ী হইতে প্রায়ই চিঠি পাইতাম। চিঠিতে অন্যান্য কথার মধ্যে সরোজিনীর কথাও থাকিত। শুনিতাম তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে কিন্তু কোথাও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইতেছে না। সরোজিনীর পিতা হরিপদ মুখোপাধ্যায় নাকি ভারি কুলীন, তিনি তো আর যাহার তাহার ঘরে কন্যাদান করিতে পারেন না।

জানাশুনার মধ্যে তাঁহাদের পালটি ঘর আমাদের গ্রামেই দুইটি আছে। তাহার মধ্যে আমরা একঘর, আর আমার পিসে মহাশয়েরা একঘর। এই দুই বাড়িতে দুইটি বিবাহোপযুক্ত পাত্র আছে, আমি একটি এবং আমার পিস্তুত ভাই সুশীল আর একটি। সুশীল আমার সমপাঠী তবে অল্পবয়সে লেখা পড়া ছাড়িয়া পশ্চিমে চাকরী করিতেছে।

এক বৎসর চলিয়া গেল, তবু সরোজিনীর বিবাহের কোনরূপ স্থিরতা না হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হইত, যেন আমারই কন্যাদায় উপস্থিত। শেষকালে ঠিক করিলাম সুশীলের সহিত সরোর বিবাহের যোগাড় করিতে হইবে; সুশীল দেখিতে শুনিতেও ভাল বটে, আর বড় ধীর। আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমি সুশীলকে চিঠি লিখিলাম "তোমার সহিত অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই; যদি পার আগামী পূজায় বাড়ি আসিও। আমি দেশে যাইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" সে সম্মত হইল।

ক্রমে পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইল, আমিও বাড়ি যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। সমস্ত জিনিষপত্র কেনা হইয়া যাইলে হঠাৎ মনে পড়িল, সরোজিনীর জন্যত কিছু লইতে হইবে। পুনর্ব্বার ছুটিয়া বাজারে যাইয়া সরোজের জন্য একশিশি কুন্তলীন ও সুশীলের জন্য একটা দেলখোস লইলাম।

যথাসময়ে বাড়ি পৌছিলাম। পৌছিয়াই আমার বাড়ি আসার কারণ মাকে বলিলাম, শুনিয়া তিনি বড় আহ্লাদিত হইলেন। তাহার পরদিনই সুশীল আসিয়া পৌছিল। পূজার কয়দিন খুব আমোদেই কাটিয়া গেল। একয়দিন কাহারও খোঁজ খবর লইবার অবকাশ পাই নাই এবং সুশীলকেও সরোজের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

বিজয়ার দিনে আমি ও সুশীল একসঙ্গে প্রণাম করিতে বাহির হইলাম। এ বাড়ি সেবাড়ি করিয়া ঘুরিয়া শেষকালে হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটিতে উপস্থিত হইলাম। আমি সরোজের মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আসিয়া পর্য্যন্ত সরোজিনীকে দেখি নাই কেন?" সরোজিনীর মা বলিলেন "সে তোমাদের বাড়ি হবার

গিয়েছিল, কিন্তু তুমি সুশীলের সঙ্গে সব সময়েই থাক বলে সে দেখা করিতে পারে নি। মার আমার সুশীলকে দেখে বড় লজ্জা হয়। হাজার হউক বড় হয়েছে; কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে একটি মনের মত বর জুটল না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কোথা?" তিনি একটা ঘর দেখাইয়া বলিলেন "সে ঐ ঘরে আছে।"

আমি সেই ঘরের দিকে চলিলাম, সুশীল বাহিরে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল, আমি ঘরের ভিতর যাইতেই অস্ফুটস্বরে "বিনয়দাদা এসেছ? আমি বলি তুমি আসবে না" বলিয়া সরোজিনী আমাকে প্রণাম করিল। আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম এমন সময় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আর আমার বাক্‌স্ফুরণ হইল না। সরোজ যে এত সুন্দর তাহা তো আগে দেখি নাই। চন্দ্রের আলোকে দেখিলাম সে আর এখন বালিকা নহে। গাম্ভীর্য্য ও পূর্ণতা তাহার মুখে কি এক নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছে, আর সেই চক্ষু দুইটি যেন কি এক মোহময়, করুণ, সুন্দর ভাবে ভাসিতেছে—যেন প্রতি দৃষ্টি আনিছে বহিয়া দূরতর স্বর্গের সন্দেশ।

আমি নীরবে সেই শোভারাশি দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল বুঝি এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও দেখি নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার পিস্তুত ভাই সুশীল এসেছে তাহাকে দেখেছ?" সে মুখ নত করিয়া বলিল "হাঁ, কই তুমি কিছু খাওনা।" আমি নাম মাত্র বসিলাম, কি খাইলাম কিছু মনে নাই, তাড়াতাড়ি সরোজকে কুন্তলীনের শিশিটি দিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। পথে যাইতে যাইতে সুশীল জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ভারি ঘাম হয়েছে দেখছি, কই আজ তো তেমন গরম নয়।" এই বলিয়া সে গল্প জুড়িয়া দিল। সে কি বলিতেছিল আমি কিছুই শুনি নাই, মাঝে মাঝে "হাঁ হুঁ" বলিয়া সাড়া দিতেছিলাম বটে, আর সুশীলের অনবরত কথার জন্য তাহার প্রতি বড় বিরক্ত হইতেছিলাম।

সমস্ত রাত্র ভাল নিদ্রা হইল না, কেবল সরোজের কথাই মনে হইতে লাগিল। ভাবিলাম সরোজকেত এতদিন দেখিয়াছি কিন্তু

এমন ভাবত আমার মনে কখনই হয় নাই। তাহার বিষয় যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই তাহার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি, মধুর হইতে মধুরতর বোধ হইতে লাগিল। নিদ্রা হইল না, সারারাত কি এক অর্দ্ধ জাগরিত সুখবিজড়িত অবস্থায় কাটাইলাম। সেই রাত্রে যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, অর্দ্ধ স্বপ্নের মত তাহাই বারবার দেখিতে লাগিলাম এইরূপে রাত্রি কাটিল।

ইহার পর দুই দিন আমি সরোজদের বাড়িতে ঘন ঘন যাইতাম। যতবার যাইতাম ততবারই আবার যাইতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু এক দিন আমার চেতনা হইল, ভাবিলাম, করিতেছি কি? তখন চিত্তের দুর্ব্বলতার জন্য আমার অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। স্থির করিলাম আর কখনও এরূপ অস্থির চিত্ত হইব না, এবং অতি শীঘ্রই সুশীলের সহিত সরোজের বিবাহ স্থির করিব।

স্থির করিলাম বটে, কিন্তু সপ্তাহ চলিয়া গেল উহা কার্য্যে পরিণত হইল না। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই আমি ধৈর্য্য হারাইতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম আমি সরোজের বাড়ী যাইতাম না, এবং সে আমাদের বাটি আসিলে, পাছে তাহার সহিত দেখা হয়, এই ভয়ে নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া থাকিতাম। মনে করিতাম আমি খুব আত্মসংযম করিতেছি, কিন্তু একদিন বুঝিতে পারিলাম ঘরে দরজা দিয়া বসিয়া থাকাটা তত নিরাপদ নহে। কারণ, আমি দেখিলাম, ঘরের ভিতর থাকিয়া আমি সরোজের প্রত্যেক কথা একমনে শুনিয়া থাকি, অন্যে কথা কহিলে বিরক্ত হই, সরোজের চুড়ীর কি মলের শব্দে ঠিক করি এইবার সরোজ চলিয়া যাইতেছে, আবার সত্যই গেল কিনা জানিবার জন্য কাণ পাতিয়া থাকি। সেতারে ঝঙ্কার দিলে যেমন সেই সুরে বাঁধা অন্যান্য সেতার আপনিই বাজিয়া উঠে, সেইরূপ সরোজের অলঙ্কারের শব্দে আমার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিত এবং সেই ঝঙ্কার গ্রামে গ্রামে উঠিয়া তাহার মধুর নিক্কণে আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত।

ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে আমার অধিক সময় লাগে নাই।

বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই আমি আপনার মন দমন করিতে চেষ্টা করিতাম। যদি আমি বলিতাম আমি সরোজকে বিবাহ করিব তাহা হইলে তাহার পিতা মাতা এবং আমার মা খুসী বই অসন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু আমার মনে হইত এত লেখাপড়া শিখিয়া নিজের মনের উপর ক্ষমতাহীন হওয়া বড়ই লজ্জার বিষয় এবং সেইজন্য আমি নিজের ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করিতাম। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সরোজের নাম শুনিলে যে আনন্দ হইত, তাহা রোধ করিতে পারিতাম না, তাহার কথা শুনিলে মন সেই দিকে ধাবিত হইত, তাহার সেখানে আসিবার সম্ভাবনা থাকিত সে স্থান হইতে চলিয়া আসিবার সময় মনে কষ্ট হইত এবং যদি তাহাকে দেখিতে পাই, এই আশায় একবার চারিদিক দেখিয়া লইতাম। সে যেস্থান দিয়া চলিয়া যাইত, সে স্থান পর্য্যন্ত পবিত্র মনে করিতাম।

এইরূপে দিন পনর কাটিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে আমার নামে অনেকগুলি অভিযোগ আসিয়াছে—প্রথমতঃ মা বলেন আমার খাওয়া দাওয়া একেবারে কমিয়া গিয়াছে, এবং আমি রোগা হইয়া যাইতেছি; দ্বিতীয়তঃ বন্ধুরা বলেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে আর ভালরূপে মিশি না; মিশিবই বা কেন, আগে যে তাঁহাদের সহিত মিশিতাম তাহাই তাঁহাদের ভাগ্য; তৃতীয়তঃ সরোজ বলে আমি আর তাহার সহিত দেখা করিনা; ইত্যাদি। আমি লজ্জিত হইয়া পূর্ব্বের মত সকলের সহিত মিশিতে লাগিলাম।

একদিন হঠাৎ সরোজের সহিত আমার দেখা হইল। সে আমাকে দেখিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পূর্ব্বে যেমন নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে আসিত, সেইরূপ আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। আমি কিন্তু মহা বিপদে পড়িলাম; কি বলিব কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। মাটির দিকে চাহিয়া, আমতা আমতা করিয়া দুই একটি কথা বলিয়াই হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। সরোজ আশ্চর্য্য হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বরাবর নিজের ঘরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। মনে

নানারূপ চিন্তা উদয় হইতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম আমার ব্যবহারে সরোজ দুঃখিত হইবে। ইহা ভাবিয়া আমারও অত্যন্ত কষ্ট হইল। তাহার পর মনে হইল, কত দিন এইরূপে চাপিয়া থাকিব, এবং তাহাতে ফলই বা কি হইবে? আরও ভাবিলাম আমি যে সরোজের প্রতি গোপনে এরূপ ভাব পোষণ করিতেছি ইহা কি ভাল? আমি যদি তাহাকে বিবাহই না করিব তবে তাহার প্রতি এরূপ ভাব পোষণ করা কি উচিত? আর সরোজকে বিবাহ করিতে আমার কি বাধা আছে, কেনই বা আমি নির্ব্বোধের ন্যায় শুধু শুধু কষ্ট পাইতেছি। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ স্থির করিলাম, যেমন করিয়া হউক, লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে জানাইব আমি সরোজকে বিবাহ করিব। সেই দিন বৈকালেই আমাদের বাহিরের রোয়াকে বসিয়া আমি কথায় কথায় বলিলাম "আমি মনে করিতাম বিবাহ করাটা উচিত নহে; কিন্তু আর আমার সে মত নাই। দেখুন না কেন, মিল্‌টন যে এত কঠোর ছিলেন, তিনিও বিবাহকে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। বাস্তবিকই বিবাহ না করিলে মানুষ অর্দ্ধেক থাকিয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রেই ত রহিয়াছে 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ'।"

রাত্রে মা আপনিই সরোজের কথা তুলিলেন, বলিলেন "বাবা, তুমি এলে সরোজের বিয়ের জন্যে, কিন্তু তুমি সুশীলের বাপ মাকে এ বিষয়ে কিছু বল নাই কেন?" আমার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, মনে করিলাম এই ত সুযোগ। দুই একবার ঢোক গিলিয়া নিজের কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় মা আবার বলিলেন "আমি সব ঠিক করেছি; তোমার কিছু ভাবতে হবে না; আর শুনেছ, সরোজ নাকি নিজেই ওর বেগুণফুল আর সইয়ের কাছে স্বীকার করেছে যে সুশীলকেই বিয়ে করবে। ডাগরটি হয়েছে কিনা?" আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম, পড়িয়া যাইবার ভয়ে কিছুক্ষণ দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া সামলাইয়া লইলাম, বলিলাম "বেশ ত এখন সব কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গেল, আমি কালই পিসে মহাশয়ের কাছে গিয়ে দিনস্থির করে আসবো"। এই বলিয়া নিজের ঘরে যাইয়া শয়ন করিলাম।

আমি সরোজের চরিত্র কিরূপ তাহা বিশেষরূপে জানিতাম। আমি জানিতাম যে তাহার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা দুই সমান। সে সুশীলকে যে বিবাহ করিবে বলিয়াছে তাহা সামান্য কারণে বলে নাই আর তাহাকে অন্যমত করান সহজ নহে এবং ঐরূপ চেষ্টা করাও নিতান্ত অন্যায়। আমি নিজের আশা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু সেই রাত্রে আমি যে যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছি তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কে বুঝিবে? নিরাশা, দুঃখ, অভিমান আমার হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ করিয়াছে তাহার ক্ষতচিহ্ন এখনও মুছিয়া যায় নাই, কখনও যাইবে কি না সন্দেহ। যাতনায় অধীর হইয়া মনকে কতরূপে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাবিলাম, আমার হৃদয় কত বড়, আমার প্রাণে কত ভালবাসা, আমার কিরূপ শক্তিসামর্থ্য তাহা 'সে' কিরূপে বুঝিবে? সে বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়াছে। সে আমার উপযুক্ত নহে। আবার মনে করিলাম সে আমাকে ভ্রাতৃভাবে দেখে, আমার তাহাকে ভিন্নভাবে দেখা অন্যায়। সামান্য কারণে এত অস্থির হওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। ভগবান যাহাকে যাহার জন্য করিয়াছেন সে ত তাহারই হইবে; আমিও দুই দিন পরে এ সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া সকলের ন্যায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইব। এইরূপ কত কি ভাবিলাম, কিছুতেই স্থির হইতে পারিলাম না, ভাবিলাম সুশীল কি আমার মত ভালবাসিতে পারে, না কখনও সেরূপ পারিবে? তবে কোন বিচারে সে সরোজকে পাইতে চলিল? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে শেষ রাত্রে একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল। কত যে স্বপ্ন দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনও দেখিলাম সরোজকে আমি পড়াইতেছি, কখনও যেন তাহার সহিত কথা কহিতেছি, কখনও আবার সেই বিজয়া দশমীর রাত্রে যেন সরোজদের বাড়ী যাইতেছি এমন সময় তাহাদের বাড়ি হইতে বাজনা বাদ্য করিয়া কাহাদের বর বাহির হইল। এক পালকীতে দেখিলাম সুশীল, বুঝিলাম সেই বর। কনের পালকী কাছে আসিলে, চাঁদের আলো তাহার মুখে পড়ায় চিনিলাম সরোজ—বিজয়া দশমীর রাত্রে যেরূপ দেখিয়াছিলাম ঠিক সেইরূপ। শেষ কালে যেন আমাকে কে

আসিয়া বলিল সরোজ মরিয়া গিয়াছে; আমি শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতেছি এমন সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সরোজ যে সত্য সত্য মরে নাই তাহাতে যে কি আনন্দ হইল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সরোজের বিবাহের কথা মনে হইলে আবার চারিদিক শূন্যময় বোধ হইল। অত্যন্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় বালিশে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম "দয়াময়, বল দাও।"

বোধহয় ভগবান প্রার্থনা শুনিলেন। আমি অনেকটা শান্ত হইলাম।

* * * * * * * * *

সেই বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের ২৬শে তারিখে আমাদের গ্রামে বিস্তর ঘটা করিয়া সরোজের বিবাহ হইল। বিবাহের পরে নাকি গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিয়াছিল সেই বিবাহে বিনয় বন্দ্যোর মত কেহই খাটে নাই, এবং বিবাহের সভায় বিনয়ের অবিরত উচ্চ হাস্যধ্বনিতে নাকি অনেকে বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এ বিবাহের দিন কতক পরেই আমি গ্রামের সকলকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে আমি যে ইতিপূর্ব্বে বিবাহের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছিল। বিবাহ করা যে একেবারেই উচিত নহে ইহাই আমার অভ্রান্ত মত এবং এই মত অনুসারেই আমি চলিব।

এখন পর্য্যন্ত আমার মত পরিবর্ত্তন হয় নাই।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
C/o Asst. Civil Judge, Cooch Behar.



অতিরিক্ত পুরস্কার ৫৲

বুদ্ধিমান রাজার স্বর্গযাত্রা।

প্রথম সর্গ।

রাজসভাতলে বসি রাজা বুদ্ধিমান,
রাজকার্য্য করিছেন প্রফুল্ল বয়ান।
হেন কালে প্রজাগণ চারিদিক হতে,
প্রণাম করিল আসি রাজচরণেতে।
বলিল একটি ঠক পশেছে নগরে,
নিশি দিন আমা সবে জ্বালাতন করে।
ঠকাইয়া ধন রত্ন সব নিয়ে যায়,
বাঁচে না প্রজারা প্রভু, কি হবে উপায়।
কোন বেশে কবে আসে বুঝিতে না পারি,
কেমনে বুঝিব প্রভু, ঠকের চাতুরী।
শুনিয়া প্রজার মুখে ঠকের কাহিনী,
অস্থির হইল রাজা পরমাদ গণি।
কহে আমি বুদ্ধিমান বুদ্ধে বৃহস্পতি,
মম রাজ্যে ঠক আসে এমন শকতি।
বুদ্ধি-জালে জড়াইয়া ঠক্‌কে ধরিব,
কত বুদ্ধি রাখে ঠক সকলি বুঝিব।
মম বুদ্ধি হতে বল কার বুদ্ধি বড়,
কেন ভয় পাও সবে যাহ নিজ ঘর।
এত কহি বুদ্ধিমান মনেতে বিচারি,
নগরে পাহারা দিল দশ পাঁচ কুড়ি।

সুরা পানে মত্ত হয়ে পাহারা সকল,
নগরের প্রান্তভাগে ঘুমায় কেবল।

দ্বিতীয় সর্গ।

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথি নিশীথ সময়,
অন্ধকারে পথ ঘাট দৃষ্টি নাহি হয়।
হেন কালে বুদ্ধিমান নিজ হর্ম্ম্যতলে,
পূজিছেন শিবলিঙ্গ অতি কুতূহলে।
চন্দন কুঙ্কুম চুয়া কুসুমের হার,
ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদি নানা উপচার।
হেনকালে ঠক এক চিন্তি মনে মনে,
ধরিল শিবের মূর্ত্তি পরম যতনে।
হরিষে হাড়ের হার গলায় পরিল,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরি নিজ বসন ত্যজিল।
খড়ি মাটী গুলি অঙ্গে রং ফলাইল,
দর্পণ ধরিয়া ভালে ত্রিনেত্র আঁকিল।
দু একটি মৃত সর্প স্কন্ধে জড়াইয়া,
চলিল রাজার কাছে বলদে চড়িয়া।
রাজদ্বারে গিয়া জোরে করে করাঘাত,
সে শব্দে রাজার ধ্যান ভাঙ্গিল হঠাৎ।
বাহিরে থাকিয়ে ঠক বম্ বম্ করে,
রাজা গিয়ে দ্বার খোলে হরিষ অন্তরে।
বলদে চড়িয়া ঠক গৃহে প্রবেশিল,
আমি শিব আসিয়াছি রাজাকে বলিল।
রাজা ভক্তিভাবে চাহি দেখে বার বার,
উপাস্য দেবতা শিব সম্মুখে তাহার।
আনন্দে অস্থির হয়ে বুদ্ধিমান রাজা,
হীরক প্রবাল দিয়ে তারে করে পূজা।

ঠক কহে তুমি রাজা ভকত প্রধান,
এ জগতে কেহ নাই তোমার সমান।
তোমায় পূজায় তুষ্ট হইলাম অতি
তাই আজি স্বর্গ ছাড়ি মর্ত্তে মম গতি।
পুণ্য কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তাতে নিশাকাল,
এ সময়ে সুরলোকে চল মহীপাল।
মর্ত্ত্যবাস তবরাজা পূর্ণ হইল আজ,
আজ তব গতি হবে দেবের সমাজ।
রাজা বলে অধমের গতি মাত্র তুমি,
এখনি তোমার সঙ্গে স্বর্গে যাব আমি।
অধম পাতকী জনে এত তব দয়া,
তোমার চরণে আমি সঁপিলাম কায়া।
ঠক বলে এক কথা শুন তবে রাজা,
স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়া নাহি হয় সোজা।
স্বর্গে যেতে মানবেরা যত কষ্ট পায়,
সে সকল কষ্ট কিন্তু স্পর্শিবে তোমায়।
যোড় হাত করি রাজা কহে তবে ধীরে,
কষ্ট বিনে স্বর্গ সুখ কেবা লাভ করে।
ঠক কহে তবে রাজা মুদ নেত্রদ্বয়,
খুলিবে, যখন মম অনুমতি হয়
বাক্যব্যয় না করিয়া চলহ ভূপতি,
বাক্যব্যয়ে হইবে না স্বর্গপুরে গতি।
এই আমি চলিলাম বলদে চড়িয়া,
নীরবে বৈসহ তুমি লাঙ্গুল ধরিয়া।

তৃতীয় সর্গ।

ঠকের ইঙ্গিত পেয়ে চলিল বলদ,
লাঙ্গুল ধরিয়া রাজা ভাবে গদ গদ।

চলিল চতুর ঠক কাঁটা পথ দিয়া,
জর্জ্জর হইল রাজা কণ্টক ফুটিয়া
কত শিমুলের কাঁটা কত বেল কাঁটা
ঘটাইল রাজ অঙ্গে শোনিতের ঘটা।
কণ্টকে কণ্টকে রাজা হল জর জর,
তবুও অটল রাজা নাহয় কাতর।
ভাবে এত কষ্ট নয় সুখেরি কারণ,
কষ্ট বিনে স্বর্গ যেতে পারে কোন জন।
রহিল কণ্টকে বিঁধি বসন রাজার,
তথাপি সঙ্কোচ দুঃখ নাহয় রাজার
ধুলা কাদা মল মূত্র শরীরে ভরিল,
তথাপি ভকত শ্রেষ্ঠ চক্ষু না মেলিল।
ভাবে অনুমতি বিনে মেলিলে নয়ন,
যদি আর নাহি হয় স্বর্গ দরশণ।
সঙ্গে করি স্বর্গে শিব না লয়েন যদি,
আমা সম অধমের কি হইবে গতি।
এত ভাবি অতি জোরে নয়ন মুদিয়া,
শিব মূর্ত্তি ধ্যান করে তন্ময় হইয়া।
ব্যথিত বলদ অতি লাঙ্গুলের টানে,
আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছোটে প্রাণ পনে,
এই ভাবে কিছুক্ষণ করিলে গমন,
রজনীর শেষ ভাগ দিল দরশন।
একটি কলুর গৃহে রাজাকে লইয়া,
কলুর ঘানির পরে দিল উঠাইয়া।
গোটা কত গরু তাতে বাধি আনি দিল,
শিক্ষিত ঘানির গরু ঘুরিতে লাগিল।
কলুর ঘানির শব্দে রাজা পুলকিত,
মনে ভাবে এই বুঝি স্বরগের রথ।

ঠক বলে শুন ওহে ভকত প্রধান,
এই রথে স্বর্গ ধামে করিবে প্রয়াণ।
চক্ষু না মেলিবে তুমি কথা না কহিবে,
তা হইলে স্বশরীরে স্বর্গ পুরে যাবে।
আমিও তোমার সঙ্গে অন্তরীক্ষে রব,
সময় হইলে ধরি স্বর্গে উঠাইব।
স্বর্গের অনেক পথ এসেছ রাজন,
এই দেখ স্বর্গ গন্ধ মধূর কেমন।
এতবলি তাড়াতাড়ি ঠক চুরামণি,
ঢেলে দিল এক শিশি "কুন্তলীন" আনি।
"কুন্তলীন" সৌরভেতে বিমুগ্ধ রাজন,
ভাবে আছে সম্মুখেতে পারিজাত বন।
সময় বুঝিয়া তবে ঠক পলাইল,
অভ্যাসে ঘানির গরু ঘুরিতে লাগিল।
ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার ঘানির শবদে,
রাজা ভাবে যাইতেছে রথ স্বর্গ পথে।
এই ভাবে বিভাবরী প্রভাত হইল,
কলুর গৃহের লোক সকল জাগিল!
ঘানির সে শব্দ শুনি আশ্চর্য্য মানিল,
এত ভোরে ঘানি ঘোড়ে গরু কে বাঁধিল।
দেখিতে চলিল সবে হয়ে একত্রিত,
ভয়ানক দৃশ্য হেরি হইল চমকিত।
ঘানি পরে উপবিষ্ট বুদ্ধিমান রাজা,
কোমল শরীরে তার কতরূপ সাজা।
পরনে বসন নাই উলঙ্গ শরীর,
শরীর কণ্টকাকীর্ণ বহিছে রুধির।
মল মুত্র মাখা অঙ্গ রাজা বুদ্ধিমান,
নেত্রদ্বয় নিমীলিত প্রফুল্ল বয়ান।

কিসের সুগন্ধ এক কোথাহতে আসে,
সে গন্ধে ভ্রমর ছোটে মনের উল্লাসে।
সকলে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসে রাজায়,
নয়ন না মেলে রাজা উত্তর না পায়।
তখন সকল লোক বিষন্ন অন্তরে,
সংবাদ কহিল গিয়া মন্ত্রির গোচরে।

চতুর্থ সর্গ।

সংবাদ শ্রবনে মন্ত্রী আশ্চর্য্য হইল,
রাজাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল।
রাজার অবস্থা হেরি অতি বিপরীত,
দাস দাসী লোক জন হল বিষাদিত।
কিসে হল এ দুর্দ্দশা জিজ্ঞাসে রাজায়,
তবু বুদ্ধিমান রাজা উত্তর না দেয়।
অবশেষে লোক জন বিষন্ন অন্তরে,
সংবাদ বলিল গিয়ে মন্ত্রীর গোচরে।
তখন আপনি মন্ত্রী সেই স্থানে গিয়া,
বিস্ময় মানিল অতি রাজাকে দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল কেন রাজা সিংহাসন ছেড়ে,
বসিয়া রয়েছ কলু ঘানির উপরে।
দাস দাসী লোক জন জিজ্ঞাসে তোমায়,
কোন জন কোন রূপ উত্তর না পায়।
হে রাজা নয়ন দুটি মেল একবার,
এই দেখ আমি মন্ত্রী সম্মুখে তোমার,
এমন দুর্দ্দশা তব কে করেছে বল,
এখনি তাহারে আনি দিব প্রতিফল।
রাজা কহে মন্ত্রী আমি মেলিল নয়ন,
আর না হইবে মম স্বরগে গমন।

স্বর্গযাত্রা করিয়াছি শুভক্ষণ করি,
তুমি কেন বাদ সাধ করিয়া চাতুরী।
পুন্যফলে স্বশরীরে স্বর্গে যাই আমি,
তাহাতে আসিয়া মন্ত্রী হিংসা কর তুমি।
মন্ত্রী কহে ভাল স্বর্গে চলেছ রাজন,
সকলি বুঝিবে যদি মেল দুনয়ন।
রাজা কহে ঘ্রাণশক্তি হীন মন্ত্রা তুমি,
স্বরগের গন্ধ যায় দশ ক্রোশ ভূমি।
এ গন্ধ কি নাহি যায় তব নাসিকায়,
নিতান্তই মূর্খ তুমি কি বলিব হায়।
মন্ত্রীও সে সুসৌরভে মোহিত হইল,
বহু অন্বেষিয়া শিশি বাহির করিল।
কহিল এ "কুন্তলীন" স্বর্গ গন্ধ নয়,
চক্ষু মেলি একবার দেখ সমুদয়।
ঠকে ঠকাইয়া তোমা এনেছে এখানে,
পরম দয়ালু ঠক মারে নাই প্রাণে।
এত শুনি বুদ্ধিমান নয়ন মেলিল,
ঠকের চাতুরী সব বুঝিতে পারিল।
নিজের অবস্থা দেখি লজ্জিত বিশেষ,
"বুদ্ধিমানের স্বর্গযাত্রা" এইখানে শেষ।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।
পুরী, উড়িষ্যা।

